নীল আকাশে লাল ঘুড়ি



নীল আকাশে লাল ঘুড়ি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
অক্ষয় তৃতীয়া ১৭ বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক :
বিজয়কৃষ্ণ দাস
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
ধ্রুব রায়

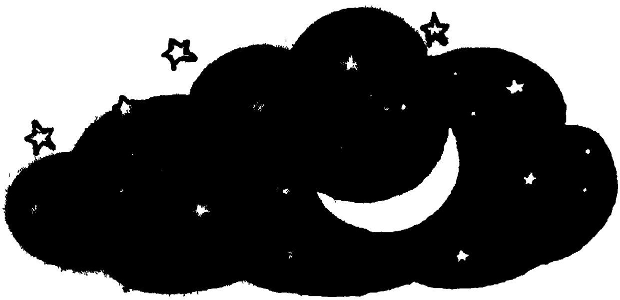
মুদ্রক :
শুভাশীষ মজুমদার
চয়নিকা
৪৭ কেশব সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৯

নীল আকাশে লাল ঘুড়ি



ভোর

সকাল। আটা কি সাড়ে আটটা। দোতলার বারান্দায় মাসিমা অপরাজিতা গাছের পরিচর্যা করছেন। রোজ যেমন করেন। টোপা টোপা ফুলে গাছ ভরে গেছে। ঘননীল রঙ। পুবের রোদ। মাসিমার ফর্সা টকটকে মুখে



নীলের আভা। সেই গানটাই গুনগুন করছেন, 'ফুল বলে ধন্য আমি।'

মেজমামা বলিষ্ঠ একটা-ক্যাঙ্গারুর মতো এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে আসছেন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন দর্শন পড়াতে। এই ব্যায়ামটা শিখে এসেছেন। মাসিমা বলছেন, এইবার থামলে হয় না। ক্যাঙ্গারুরাও মাঝে মাঝে রেস্ট নয়।' কোনো ফল হল না।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ঠিক নিচের উঠনে। বেশ বড় বাঁধানো উঠোন। দাঁড়িয়ে থাকার কারণ, মোবাইলে বড়মামার সংক্ষিপ্ত আদেশ, 'মাল

যাচ্ছে। ডেলিভারি নিবি।'

'তুমি কোথায় আছ? কী মাল?'

কটাস্‌, লাইন কেটে দিল। সাতসকালে কোথা থেকে কী মাল আসবে' নিচের উঠোনে একটা রবারের বল থাকে। আমি আর বড়মামা মাঝে মাঝে খেলি। পাশেই মাসিমার বিশাল রান্নাঘর। বড়মামার এলোপাথাড়ি শটে অনেক কিছু চুরমার হয়েছে। মাসিমা প্রতিবাদ করায় বড়মামা স্লোগানের মতো করে বলেছে। 'ভাঙচি ভাঙবো।'

মাসিমা বলেছিলেন, 'এমন বদ ছেলেকে হস্টেলে দেওয়া উচিত।'

এত বড় একটা নামকরা ডাক্তার, কিন্তু শিশুর মতো সরল। আমি সেই কারণে বেস্ট ফ্রেন্ড। আমাকে নিয়ে একদিন ঘোষালদের বাগানের পাঁচিল টপকে আম চুরি করতে গিয়েছিলেন। ধরা পড়ে গেলুম। ঘোষালমশাই অবাক, 'ডাক্তারবাবু আপনি? আমার মরা ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন। ক'ঝুড়ি [illegible]। বোম্বাই, ল্যাংড়া, হিমসাগর, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বড়মামা বললেন, 'সে হবে [illegible] আনন্দ।'

ঘোষালমশাই মহানন্দে [illegible]কে বেঁধে দিচ্ছি, যত পারেন চুরি করুন।'

বড়মামা গম্ভীর মুখে বললেন, '[illegible] সেটা আর চুরি থাকে না, সেটা তখন হয়ে যায় নেওয়া।'

সদরে একটা টেম্পো দাঁড়াল। প্রথমেই ঢুকলো একটা খাট, যে-খাটে চাপিয়ে শ্মশানে ডেডবডি নিয়ে যাওয়া হয়। এল একটা তোশক সাদা চাদর দিয়ে রোল করা। অনেকটা নারকোলদড়ি, মোটা লম্বা দুটো বাঁশ। মোটা দুপ্যাকেট ধূপ। একটা মাটির কলসি। উঠনের মাঝখানে সব জড় হল। দুজনের একজন বললেন, 'মাল মিলিয়ে নিয়ে চালান সই করে দাও। সন্ধের মুখে ফুল, মালা, ধামা ভর্তি খই আর খুচরো পয়সা এসে যাবে।'

ওপরের বারান্দায় দুটো মুখ ঝুঁকে আছে। মেজমামার মুখ থেকে কথা বেরল, 'বাড়ি ভুল হয়েছে। এ-বাড়িতে কেউ মারা যায়নি।'

'যাবে, রাত বারোটার সময় বড়বাবু অক্কা পাবেন।'

'কোন জ্যোতিষে বলেছে?'

'যিনি যাবেন তিনিই বলেছেন।'

বিকট শব্দে টেম্পো চলে গেল। মাল পড়ে রইল উঠনে।

কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং বড়মামা এলেন। মাসিমা রান্নাঘরে। ভীষণ গম্ভীর। চিত্রা শিলে মশলা বাটছে। ধনে, জিরের গন্ধ। হরিদা রোজকার মতো খিড়কির পুকুর থেকে একটা রুই মাছ তুলে দিয়ে গেছে। কলতলায় চোখ উলটে চিৎপাত। মাসিমার শিক্ষাপ্রাপ্ত তুলতুলে, থাপুর থুপুর আদুরে বেড়াল সুন্দরী অদূরে আধবোজা চোখে পাহারা দিচ্ছে। কার্নিসে দুটো সংযত কাক ঘাড় কাত করে কেবল দেখছে। ডাকছে না।

বড়মামা ঢুকেই বললেন, 'বাঃ, সব রেডি। তুই টেপটা নিয়ে আয়।"

উঠোনের ওই মাথায় বেদিতে বসে মেজমামা অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা ক্যাঙ্গারু কাপে নিউজিল্যান্ডের কফি পান করছিলেন। পরপর তিন দিন বাক্যালাপ বন্ধ। সামান্য কারণে। অস্ট্রেলিয়া ভাল না ইংল্যান্ড ভাল। বড়মামা বলেছিলেন, ইংল্যান্ড ইজ ইংল্যান্ড। খাঁটি সায়েবরা ইংল্যান্ডে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার সব ট্যাঁশ গরু। এই অবধি প্রবলেম ছিল না হঠাৎ সুকুমার রায় আবৃত্তি করায় কেস জন্ডিস হয়ে গেল,

ট্যাঁশ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে;
যার খুশি দেখে এস হারুদের অফিসে।
চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত,
ফিটফাট কালো চুলে টেরিকাটা চোস্ত।

এই শেষ দুটো লাইনে মেজমামা নিজেকে খুঁজে পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'তুমি একটা ট্যাঁশগাধা।'

যথারীতি মাসিমা খুন্তি হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাক্যযুদ্ধ বন্ধ করলেও কথা বন্ধ হয়ে গেল।

বড়মামা মেজমামাকে লক্ষই করেননি। টেপটা পেয়ে পকেট থেকে একটা ক্যাসেট বের করে চালিয়ে দিলেন, খোল-করতাল সংযোগে গম্ভীর, গম্ভীর সমবেত গলা, বলো হরি, হরিবোল, বলো হরি-হরিবোল।

মাসিমা বিশেষ একটা কিছু রাঁধছিলেন—রবিবারের স্পেশ্যাল। সেটাকে সামলে বেরিয়ে এসে কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, 'জানতে পারি, ব্যাপারটা কী?" বড়মামা বললেন, 'নিশ্চয়! তোকে না জানিয়ে কবে আমি কোন কাজ করেছি! তার আগে বাঙালি কাপে এক কাপ দার্জিলিং চা খাওয়াবি কুসী। নো নিউজিল্যান্ড, নো অস্ট্রেলিয়া।'

বড়মামা এতক্ষণে বেদির দিকে তাকালেন। মেজমামা বসে আছেন। খুঁচিয়ে ঘা করার কোনো দরকার ছিল না; কিন্তু বড়মামার স্বভাব। বললেন, 'বাবা, গণপতি! কপি খাচ্ছেন, কপি।' তারপর বিকট সুরে,

গণেশদাদার পেটটি নাদা
গায়ে মেখেছেন সিঁদুর,
কলাগাছকে বিয়ে করেছেন,
বাহন তাঁহার ইঁদুর।

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'পাগলে কি-না বলে, ছাগলে কি না খায়।'

মাসিমা এসে পড়ায় ব্যাপারটা অধিক দূর এগলো না। বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'মানুষ যখন মরে যায়, তখন সে একেবারেই মরে যায়।'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কি আবিষ্কার! নবেল পুরস্কার পেলেই হয়।'

বড়মামা বললেন, 'দেখছিস কুসী!'

মাসিমা বললেন, 'অ্যায়! চুপ!'

বড়মামা চলছেন, 'তাকে যখন খাটে চাপিয়ে হরি হরি বলে নিয়ে যায়, জীবনের এত বড় একটা ইভেন্ট, এত বড় একটা সেনসেসানের সে কিছুই জানতে পারে না, তার ফিলিংসের আমরাও কিছু জানতে পারি না, তাই....।'

'তাই কী?'

'আজ রাত বারোটায় আমি জ্যান্ত-মড়া হব। আমার চার সাকরেদ আমাকে কাঁধে করে, ধূপ জ্বালিয়ে, খই-পয়সা ছড়াতে ছড়াতে শ্মশান

পর্যন্ত যাবে। শবাচ্ছাদনের তলায় এই ক্যাসেটটা বাজতে থাকবে। আবার আমি ফিরে আসব।'

মেজমামা বললেন, 'পাগল ভালো কর মা।'

মাসিমা বললেন, 'উঃ, মা মারা গিয়ে কি বাঁশ যে দিয়ে গেছে আমাকে!' মেজমামা হঠাৎ খুব উৎসাহ পেয়ে গেলেন, 'আইডিয়া, আমি আগে আগে খই ছড়াতে ছড়াতে যাব। সাতদিন অশৌচ পালন করব। তারপর ঘাটকামান, ঘটা করে শ্রাদ্ধ হবে। ওঁগঙ্গা চিঠি। নিয়ম ভঙ্গ। এরপর বড়কে যে দেখবে ভূত ভেবে দৌড়ে পালাবে। তখন গয়ায় পিণ্ডি দিতে যাব। ডিসপেনসারি বন্ধ, প্র্যাকটিস বন্ধ। আর, আরসব সম্পত্তির মালিক আমি। তুমি যখন রাত বারোটায় মরবে, তখন অ্যায়সা চিৎকার করে কাঁদব পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যাবে। তোমার সব কিছু আমার, আমার। মৃত্যুর পরে, আরো পরে, আরো পরে কি হয় সেটাও তো জানা দরকার। তাছাড়া চুল্লির উত্তাপ, সেটাও ত জানা দরকার। সঙ্গে যখন আছি, ঢুকিয়েও দিতে পারি।'

বড়মামা চিৎকার করে উঠলেন, 'মার্ডার, মার্ডার!'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়িতে কান্নার রোল। ছুটতে ছুটতে অলকা এল। চুল উড়ছে। পায়ে চটি নেই, 'কাকাবাবু মা...'। এইটুকু বলতে পারল। বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'কুইক, কুইক!'

বড়মামা ছুটছেন। ডাক্তারি ব্যাগ হাতে আমি পেছনে। রান্নাঘরের বাইরে, চাতালে অলকার মা চিত হয়ে শুয়ে আছেন। আমাদের এই দক্ষিণপাড়ার সকলের প্রিয় দিদি। স্কুলের শিক্ষিকা। বড়মামা ইঞ্জেকশান দিলেন। ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করলেন। হল না। প্রাণ আর ফিরে এল না। মাসিমা, মেজমামা। কেউই আর একটু আগের লোক নয়। মা আর মেয়ের ছোট্ট সংসার। মা চলে গেলেন। তরতাজা, সুন্দর এক মহিলা। গভীর ঘুম।

অলকার মাথা বুকে চেপে ধরে মাসিমা বারে বারে বলছেন— 'আমি আছি। আমরা আছি।'

বড়মামার খাট, ফুলে ফুলে ঢাকা দেহ। এক আকাশ তারা, একটু,

চাঁদ। বারান্দায় মাসিমার পাশে অলকা। পাথরের মূর্তি। আমরা শ্মশানের দিকে এগোচ্ছি। গঙ্গার বাতাস গায়ে লাগছে।

শেষ রাতে গঙ্গার কিনারায় দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, 'কিস অফ ডেথ। মৃত্যুর শীতল ঠোঁট আমি স্পর্শ করেছি।'

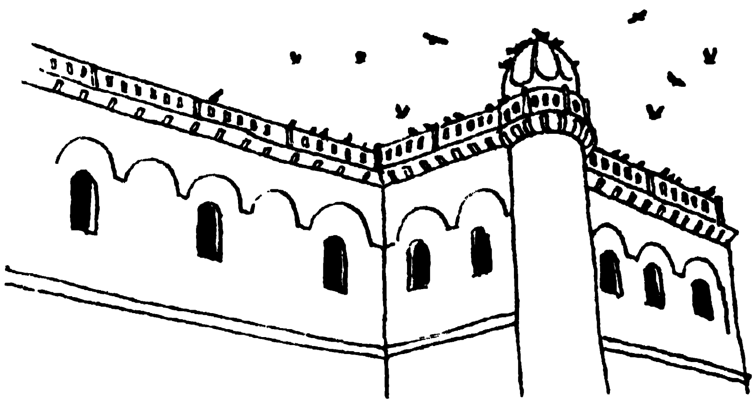
মেজমামার চোখে জল। বললেন, 'বাজে জিনিস। মৃত্যু একেবারে থার্ডক্লাস। প্রতিজ্ঞা কর, আমার আগে তুই মরবি না।'

ভোরের বাতাসে কত প্রাণ! আকাশে কত আলো!



ঘুরঘুরে

কলেজ জীবনে আমাদের চারজনের একটা দল ছিল। সেই দলের আবার একটা নামও ছিল 'ঘুরঘুরে'। ছুটি ছাটা থাকলে আমরা বেরিয়ে পড়তুম। সেই সময়টা ভারতবর্ষের খুব একটা সুন্দর সময়। কয়েক বছর আগে



দেশ স্বাধীন হয়েছে। ওদিকে নেহরু ছুটছেন, এদিকে বিধান রায়। আমরা সব স্বপ্নে ভাসছি। নতুন ভারত জাগছে। সারা দেশে একটা দলেরই শাসন। গুচ্ছের দলের গদি ধরে টানাটানি খেলা নেই। পকেটে পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র ঘোরে না। আর-ডি-এক্স জড়ানো 'মানব-বোমা' তৈরি হয়নি। একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক হত্যা-মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু। নানা রকম অসুখেই মানুষ মরত। যে মৃত্যুর নাম ছিল 'ন্যাচারাল ডেথ'। চারপাশে অনেক হাসি-খুশি ডাক্তার ছিলেন। যাঁদের সঙ্গে রুগিরা প্রাণ

খুলে দু-চারটে রোগের কথা কইতে পারত সাহস করে। ফিজ-মাত্র পাঁচ টাকা, কি দশ টাকা। বাড়িতে এলে। চেম্বারে-আড়াই টাকা। পেটেন্ট ড্রাগস তেমন ছিল না বললেই চলে। ডিসপেনসারি থেকেই ওষুধ দিতেন কম্পাউন্ডার। মিকশ্চার আর পুরিয়া। কম্পাউন্ডার জিজ্ঞেস করতেন. 'শিশি এনেছ?' বিরাট দুটো কাচের জারে লাল, নীল তরল। শিশির গায়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিতেন কিরি-কিরি করে কাটা কাগজ। মাত্রার নির্দেশ। এই রকম বলতেন, সকালে এক দাগ, রাতে এক দাগ। আর এই চোদ্দোটা পুরিয়া। এ-বেলা একটা, ও-বেলা একটা। পয়সার যা-কিছু লেনদেন এই কম্পাউন্ডারের সঙ্গে। দ্বিতীয়বার আর যাওয়ার প্রয়োজন হত না। সেকালের রোগ-বালাই একালের মতো খ্যাঁচড়া ছিল না। কাশতে কাশতে কাশি একদিন সরে পড়ল, কাঁপতে কাঁপতে জ্বর একদিন ছেড়ে গেল। একটাই ঘিনঘিনে ব্যাধি ছিল টিবি। ধরেছে কি মরেছে। প্রত্যেককেই বসন্তের টিকে নিতে হত। পক্স হবে না, হবে চিকেন পক্স। তার আবার মিষ্টি দিশি নাম মায়ের দয়া। এই দয়ায় দিন-পনেরো মশারি-বাস। কাছে কেউ আসবে না। দূর থেকে বাক্যালাপ। দুরন্ত সাহস ছিল মানুষের। মানসিক প্রস্তুতিও ছিল। মায়ের দয়ায় একজন কাত হলে বাড়িসুদ্ধ সকলেরই হওয়ার সম্ভাবনা। তবে ছাড় আছে। আগেই যে দয়া পেয়েছে, সে এই মায়ের দয়া দ্বিতীয়বার আর নাও পেতে পারে।

চারিদিকে সব বড় বড় সংসার। ভাই-বোনদের ছড়াছড়ি। ঝগড়া আছে, ভাব-ভালবাসা আছে। প্রাচুর্য আছে, দারিদ্র্য আছে; তবু সময়টা তখন এইভাবে ভেঙে পড়েনি। প্রচার মাধ্যম এতটা বেপরোয়া হয়ে ওঠেনি। আর সকলেরই পায়ের তলায় মাটি ছিল। ভবিষ্যতে কী হবে ভেবে বর্তমানটাকে কেউ 'ম্যাসাকার' করে ফেলত না। দুজন মানুষ এক জায়গায় হলে ফাটাফাটি হাসি শোনা যেত। বড়লোকরা অবশ্য চিরকালই 'গ্লুমি'। ছড়ি হাতে বেড়াতে বেরলে বোঝা যেত না, ছড়ি বেড়াচ্ছে, না বাবু বেড়াচ্ছে। দুটোই সমান স্টিফ। ওই সময়টায় জমিদারদের খুব দুর্দিন চলছিল। বাড়িও ফাটছে, সম্পর্কেও চিড় ধরছে। মামলা-মকদ্দমা, পার্টিসান। পুজোর দালানে দুর্গাপুজোর ঢাক বাজছে কেঁদে কেঁদে। ফর্সা,

ফর্সা মহিলারা পূজাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠিকই, তব পা-ফেলার ভাষায় অনিশ্চয়তা। অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছাড়া-কুকুর হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে মনে যেমন আঘাত লাগে, বড়লোকরা গরিব হয়ে গেলে সহ্য করা যায় না। খুব দুঃখ হয়। আমাদের 'ঘুর-ঘুরে' দলে সুন্দর চেহারার এক জমিদার পুত্র ছিল। বিশাল বাড়ি ভেঙে পড়ছে। বাবা-কাকারা মামলা লড়ছে। ছাদের গম্বুজে গোলা পায়রার ঝাঁক। চারিদিকে আগাছা। সুসময়ে এই বাড়ির বিয়েতে জোড়া সানাই ভৈরবীতে তান তুলত। সন্ধ্যার পর ইমনে কাঁদত। দিস্তে দিস্তে বড়লোক চারপাশে থইথই। আমাদের এই বন্ধুর সুন্দরী বোনকে এক ঝলক দেখে আমাদের দলের এক বন্ধুর 'মেন্টাল হসপিট্যালে' যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। পর পর কদিন ত্রিফলার জল খাইয়ে মেরামত করা হল। মাঝখান থেকে তার আর বিয়ে করাই হল না। যে মেয়েই দেখানো হয়, বলে, 'ওর মতো নয়।' সেই মেয়েটি হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল। খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন মনে হয়েছিল, কী আর এমন ব্যাপার। এখন এই বৃদ্ধ বয়েসে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে ভাবি, কোথায় সে গেল! এখন সে কোথায় আছে! ভালো আছে তো!



অঞ্জলি

স্নান করে ঠাকুরঘরে ঢুকেই প্রভাত অবাক হয়ে গেল। গত পাঁচ বছরে এরকম ব্যতিক্রম তার কখনো চোখে পড়েনি। পুজোর সব আয়োজন ঠিক রয়েছে কিন্তু পুজোর ফুল কোথায়? ফুলের থালা গঙ্গাজলের ঘটির উপরে বসানো, কিন্তু থালা শূন্য। এক থালা ভর্তি লাল আর সাদা ফুল, সেই পরিচিত পবিত্র দৃশ্য আজ অনুপস্থিত। এই সময়টা তার খুব তাড়া থাকে। ৮.৫৫ ট্রেন ধরে তাকে কলকাতায় ছুটতে হবে। দশটায় অফিস। এক মিনিট এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। অথচ অফিস বেরোবার আগে কুল-দেবতার পুজো করতেই হবে। ঠাকুরঘর থেকে গলা বাড়িয়ে প্রভাত চিৎকার করতে লাগল—কল্যাণী, আমার পুজোর ফুল কই? কি যে করো বুঝি না। একে দেরি হয়ে যাচ্ছে! কল্যাণী আঁচলে রান্নার হাত মুছতে মুছতে দৌড়ে এল।—কী হয়েছে কী, চেঁচাচ্ছো কেন? ফুল নেই?

—থাকলে চেঁচাই, নেই বলেই তো চেঁচাচ্ছি।

—সে কি, পুতুল সেই সাতসকালেই ফুল তুলতে গেল! এখন বাজে কটা?

—কটা আর সাড়ে সাতটা হবে, রেডিওয় খবর হচ্ছে।

—সে কি গো, মেয়ে তো সেই ছয়টায় বাগানে গেল ফুল তুলতে। কোনোদিন তো এত দেরি করে না! দাঁড়াও দেখছি কী হল!

—দেখতে দেখতেই বাজিমাত। বিনা ফুলেই পুজো করি। প্রভাত খুঁত খুঁত করতে করতে পুজোর আসনে বসল। কল্যাণী তাড়াতাড়ি মেয়েকে খুঁজতে গেল। উনুনে ভাত ফুটছে। একটু পরেই প্রভাত খেতে বসবে। তার আবার সব সাত্ত্বিক ব্যাপার। নিরামিষ ভাতে ভাত খাওয়াই তার অভ্যাস। কোনোদিন একটু ঘি থাকে, কোনোদিন থাকে না। খাওয়ার ব্যাপারে প্রভাতের কোনো দৃকপাত নেই। কিন্তু পুজোর আয়োজনে

সামান্য ত্রুটিও তার সহ্য হয় না।

আজ দশ বছর হল কি তারও বেশি হবে পনেরো বছরও হতে পারে, কল্যাণীর ঠিক মনে পড়ছে না তাদের বিয়ে হয়েছে। সুখের সংসারই বলা চলে। কোনো ঝামেলা নেই, নির্ঝঞ্ঝাট। একটি মাত্র মেয়ে বারো-তেরো বছর বয়স। ফুটফুটে সুন্দর। প্রভাতের বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। জোর করে ধরে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় দু'ভাই সন্ন্যাসী। পরিবারে অন্তত এই ভাইও যদি বিয়ে না করে বংশ রক্ষা হয় কী করে?



এঘর-ওঘর পড়ার ঘর, সব ঘর খুঁজে দেখল কল্যাণী। না, সারা ঘরবাড়ির কোথাও পুতুল নেই। কী হল মেয়েটার? সেই সাতসকালে বাড়ির পিছনের বাগানে ফুল তুলতে গিয়েছিল। রোজই সে যায়। ফুল তোলা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। ফুল তোলার মতো বয়স তার হয়েছে। সকাল থেকে কল্যাণীকে এত ব্যস্ত থাকতে হয়—চা, জলখাবার, খাবার! পুতুল তাই ইদানীং, মাকে ফুল তোলার কাজ থেকে ছুটি দিয়ে নিজেই সেকাজ করে। তার ভালো লাগে। ভোরের পাখি গাছে গাছে। ফুলে

ফুলে চারিদিক সাদা হয়ে থাকে। গ্রীষ্মের সকাল, যেন এক অসাধারণ কিছু। ঠিক রোদ উঠার আগের মুহূর্তে, পৃথিবী আর আকাশের মাঝখানে একটা হাল্কা কুয়াশার চাদর কাঁপতে থাকে। ফুল তোলার ফাঁকে ফাঁকে সে একটু আকাশ দেখে নেয়, কখনও নাম-না-জানা কোনো পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে।

বাড়িতে যখন কোথাও মেয়েকে পাওয়া গেল না, তখন কল্যাণী পিছনের দিকে দরজা খুলে বাগানে চলে গেল। একবার মনে হল উনুনে ভাত ফুটছে, বোধহয় বেশি সিদ্ধ হয়ে গেল। প্রভাত আবার গলা ভাত খেতে পারে না। তারপর ভাবল একদিন না হয় খাবে, আগে দেখি মেয়েটা কোথায় গেল। কল্যাণী ভেবেছিল বাগানের কোথাও হয়তো দেখবে গাছের তলায় কি পুকুরঘাটে বসে আছে চুপ করে, কি ঘুমিয়েই পড়েছে হয়তো কিংবা কোনও বন্ধুর সঙ্গে গল্পে মত্ত।

খুব একটা বড় বাগান নয় এ-কোণ ও-কোণ ঘুরে দেখতে বেশি সময় লাগল না। না কেউ কোথাও নেই। পুকুরঘাটেও কেউ নেই। টলটলে জলের উপর গাছের ছায়া দুলছে। পোষা মাছটা ঘাটের ধারে এসেছে খাবার আশায়। এসব দেখার সময় কল্যাণীর নেই। এইবার সে খুব ভাবনায় পড়ল। কোথায় গেল মেয়েটা? কখনো না বলে বাড়ির বাইরে যায় না। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রাখল—ফ্যান গালার কথা তার মনেই রইল না। হাত দুটো কোনোরকমে আঁচলে মুছেই ঠাকুরঘরে দৌড়ল। দরজার বাইরে থেকে দেখল প্রভাত আসনে স্থির হয়ে বসে আছে, দু'চোখের কোল বেয়ে জলের বিন্দু নেমেছে। খুব পরিচিত দৃশ্য। ওই দৃশ্য কল্যাণীর মনে কেমন একটা নির্ভরতার ভাব আনে। তার মনে হয় যার স্বামী এত ভক্ত, যে বাড়িতে এত পুজোআচ্চা, সে বাড়িতে কোনও অমঙ্গল আসতে পারে না। কল্যাণীর মন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে পুতুলের চিন্তা চলে গেল।

প্রভাত আসন ছেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী তাকে খবরটা জানাল। বাড়ির কোথাও পুতুলকে পাওয়া যাচ্ছে না। ধ্যানের পর প্রভাতকে কেমন প্রশান্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল! প্রভাতের মুখে কোনো বিকৃতি দেখা গেল না।

শুধু জিজ্ঞেস করল, কটা বেজেছে। কল্যাণী বলল, ঘড়ি দেখিনি। প্রভাত অনুমানের উপর সময় ঠিক করে নিল। বলল, ঠিক আছে, আমি দেখছি, কোথায় আর যাবে, হয়তো আশেপাশে কোনো বাড়িতে গেছে।

—কিন্তু এমন তো কোনোদিন করে না।

—আহা ছেলেমানুষের খেয়াল। কী ভেবেছে, কোথায় কার বাড়িতে গিয়ে বসে আছে।

—বলে যাবে তো?

—ঠিক আছে, তুমি রান্নার কাজে যাও আমি দেখছি।

কল্যাণী রান্নাঘরে গেল। প্রভাত পুজোর চেলি ছেড়ে বাড়ির বাইরে বেরলো মেয়েকে খুঁজতে।

দূরে রেলের লাইন পাতা। সিগন্যাল পড়েছে। ডাউনের দিকে কোনো ট্রেন আসছে। প্রভাত বাড়ির বাইরে এসে একবার ভেবে নিল, এখন সে কী করবে! প্রথমে সে বিনোদবাবুর বাড়ি গিয়ে খোঁজ করল। সকালে প্রভাতকে দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন। বিনোদবাবুর মেয়ে ফুলা বলল—না পুতুল তো আসেনি। আজ কেন সে গত দু'দিন আসেনি। বিনোদবাবু প্রভাতকে বসতে বললেন।

—না এখন আর বসব না। বেরোতে হবে। তার আগে মেয়েটাকে খুঁজে দেখি!

—কোথায় আর যাবে? কাছাকাছি কোথাও আছে।

প্রভাত একে একে পাড়া প্রতিবেশী সকলের বাড়ি দেখল! না কোথাও পুতুল নেই এবং আসেওনি। সকাল থেকে তারা কেউ দেখেনি।

প্রভাতের মুখে বেশ ভাবনার রেখা পড়ল। মোক্ষদা পিসি বললেন—সে কি বাবা, দিনকাল বড় খারাপ। শুনছি, একটা করে ফুল শুঁকতে দিচ্ছে, তারপর ছেলে আর মেয়েগুলো সুড় সুড় করে ছেলেধরার পিছু পিছু গ্রামের বাইরে চলে যাচ্ছে।

প্রভাত এসব বিশ্বাস করে না। পিসি কেমন আছ? বলে পাশ কাটিয়ে চলে এল।

—কী হল একবার খবরটা দিয়ো প্রভাত? বড় চিন্তায় রইলুম।

প্রভাত 'আচ্ছা' বলে বাড়িমুখো হল।

কল্যাণী মুখে একরাশ চিন্তা মেখে দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল, প্রভাতের খবরের আশায়। ভেবেছিল পুতুলের হাত ধরেই হয়তো সে এসে হাজির হবে আর কল্যাণী পুতুলকে খুব বকবে। এতক্ষণের উৎকণ্ঠা ১০
বকুনিতে ভেঙে পড়বে। স্বামীকে দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল।

—না পুতুল কোথাও নেই, কোনো বাড়িতেই সে যায়নি। সকাল থেকে তাকে কেউই দেখেনি।

—সে কী?

—এখন কী করা যাবে?

প্রভাতও জানে না, এরপর কী করার আছে। শুনেছে এরপর পুলিশে খবর দিতে হয়। খোঁজার পরিধি তখন আরো বেড়ে যায়। গ্রাম থেকে গ্রামে, জেলা থেকে জেলা শহরে, কলকাতায়। সারা বাংলা কিংবা সারা ভারতবর্ষে থানায় থানায় খোঁজপাত চলে। এসব তার শোনা আছে। নিজের জীবনে এইরকম একটা সমস্যা নেমে আসবে তার ধারণার অতীত।

—আজ আর অফিস যেয়ো না।

—সে তো বটেই।

এরপর চুপচাপ দুজনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কোনো কথা মুখে জোগাল না। সব কথা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে। প্রভাত হঠাৎ বলল—চলো তো আর একবার বাগানটা দেখি। কল্যাণী আর প্রভাত বাগানে এল। স্থলপদ্মের গাছে বড় বড় ফুল ফুটেছে! টগর গাছ সাদা হয়ে আছে ফুলে। ছোট ছোট গোটাকতক প্রজাপতি ছটফট করে উড়ে বেড়াচ্ছে। সব জায়গা তারা খুঁজল, আর একবার খুঁজল। যেন খবু ছোট একটা জিনিস হারিয়েছে। একবারের খোঁজায় হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে। হয়তো পুতুল দুষ্টুমি করে চোর চোর খেলছে, গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। দু'জনে দুদিক থেকে খুঁজল। না পুতুল নেই।

প্রভাত এসে ঘাটের বাঁধানো রকে একটু বসল। জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—এরপর কী করবে? সত্যি থানায় যেতে হবে? না হঠাৎ পুতুল এসে মা, মা করে ডাকবে। জলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রভাত একটা জিনিস লক্ষ্য করল, পশ্চিম পাড়ে যেখানে জবাগাছের একটা ডাল জলের উপর ঝুঁকে এসেছে তার একটু দূরে একরাশ ফুল জলের উপর ভাসছে। জবা গাছ থেকে একটা দুটো ফুল জলে পড়া বিচিত্র নয় কিন্তু টগর এল কোথা থেকে? টগর গাছ তো জল থেকে অনেক দূরে। জলের উপর সাদা আর লাল একরাশ ফুলের অঞ্জলি কে ছড়িয়ে দিল?

স্বামীর পাশে এসে কল্যাণীও বসল।

প্রভাত শুধু বললে, দেখেছ। একটা জায়গাতেই কত লাল আর সাদা ফুল একসঙ্গে ভাসছে! কে যেন অঞ্জলি দিয়ে গেছে।

কল্যাণী অন্যমনস্ক। জিজ্ঞেস করে বসল, কেন?

প্রভাত বললে, কেন? মনকে শক্ত করো কল্যাণী। এই কেন-র উত্তর বড় সাংঘাতিক। মাঝপুকুরে ওটা কি ভাসছে দেখেছ? একটা সাজি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুকুরে জাল নামানো হল। সামান্য অনুসন্ধানেই জালে জড়িয়ে উঠে এল পুতুলের দেহ। ফুল ছাপ ফ্রক পরা এক সুন্দরী কিশোরী। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে, সে ঘুম আর ভাঙবে না, কোনোদিন।

প্রভাত শুধু এই বলতে পারল, মা, এই কটা বছরের জন্যে মায়ার বাঁধনে কেন বাঁধতে এসেছিলিস! কার পুজো করছিলিস, বিরাটের? সে যে বড় নিষ্ঠুর!

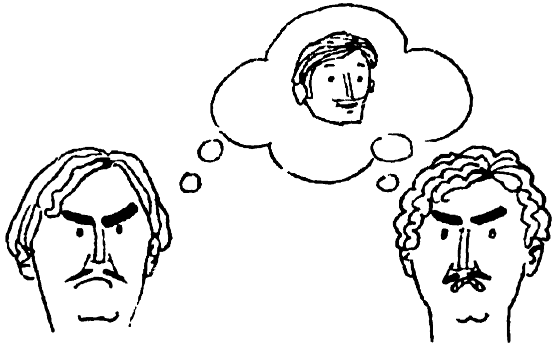
তারপর কত বছর গড়িয়ে গেল রেলগাড়ির মতো জন্ম মৃত্যুর জোড়া লাইন ধরে। প্রভাতের ঠাকুরঘর এখন ওই দিঘির পাড়। রোজ সকালে সে নিজে ফুল তোলে, লাল আর সাদা। সাজি ভরে। প্রভাত আর কল্যাণীর বয়েস বেড়েছে। চুলে পাক ধরেছে, কপালে সময়ের রেখা পড়েছে। বয়েস বাড়েনি পুতুলের। সে এখনো সেই কিশোরী। প্রভাত

যখন ফুল তোলে, গাছের আড়ালে আড়ালে সে ঘোরে। প্রভাত তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, বাবা! এদিকে এসো, এদিকে। দেখ, এই ডালে কত ফুল! সাজি ভর্তি ফুল আর ঠাকুরঘরে যায় না। প্রভাত প্রণামের ভঙ্গিতে দীঘির পাড়ে বসে সেই সমস্ত ফুল অঞ্জলি দেয় জলে। ভাসতে থাকে লাল আর সাদা ফুল। এই তো তোমার পূজা! আছ অনল, অনিলে, চির নভোনীলে। ভূধর সলিল গহনে।



স্লাই ফক্স

রাতের খাওয়া শেষ। আমরা সবাই খাবার টেবিলে বসে আছি। আর পাঁচ মিনিট পরে এগারোটা বাজবে। বাইরে পূর্ণিমা রাতের বীভৎস চাঁদের আলো। ফুল ভোল্টেজ। খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ খুঁজে আনা যায়। খাওয়াটার জবরদস্ত হয়েছে। মাসিমার ট্রেনিং-এ গান্ধারীদির রান্না এমন খুলেছে, পাঁচ তারা হোটেলের শেফ করে দেওয়া যায়। মেজমামা পরপর তিনটে ঢেকুর তুলেছেন। আর একটা তোলার জন্যে খুব চেষ্টা করছেন।



বড়মামা ভীষণ চিন্তিত মুখে বললেন, 'কঠিন অঙ্ক।'

মেজমামা বললেন, 'কী এমন কঠিন অঙ্ক! পৃথিবীতে এমন কোনো অঙ্ক নেই.

যা আমি কষতে পারি না! আমাকে বলবে তো!'

বড়মামা বললেন, 'এই বিশাল বড় খাবার টেবিলটা সমান তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। ভাগ করার পরেও টেবিলই থাকবে।'

মেজমামা বললেন, 'এটা একটা প্রবলেম'? কল এ ছুতোর মিস্ত্রী।

সে ফিতে ফেলে মেপে, করাত দিয়ে কেটে দেবে।'

বড়মামা হুঁ হুঁ করে হেসে বললেন, 'নট দ্যাট ইজি। হোয়াটস অ্যাবাউট পায়া।

তিনটে টেবিল মানে বারোটা পায়া। আছে চারটে পায়া। আরও আটটা পায়া চাই।

তা ছাড়া টেবিলটা ওভাল। একটা উপায় আছে পার্টিসান।'

মাসিমা বললেন, 'তোমার সব অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনা। লোকের বাড়ি পার্টিসান হয়, টেবিল পার্টিসানের কথা শুনিনি।'

'এইবার শুনবে। এই বাড়ির সব কিছু আমি এক মাসের মধ্যে তিন ভাগ করে দেবো।

এমন কি শালগ্রাম শিলাও সমান তিনটুকরো হবে।'

মেজমামা বললেন, 'রুপোর সিংহাসনটা?'

'গলিয়ে সমান ওজনের তিনটে সিংহাসন হবে।'

'মজুরি কে দেবে?'

'সমান তিনভাগে আমরা তিন তরফ দেবো।'

'ও এর মধ্যে তরফা তরফি এসে গেল। তুমি আলাদা হতে চাইছ। তোমার মনে পাপ ঢুকেছে!

অত চিংড়ি মাছ খেলে ঢুকবে না! পাপের দাঁড়া বেরিয়েছে লম্বা, লম্বা।'

'যেমন মাগুর মাছ খেয়ে খেয়ে তোর মুগুরের মতো অহঙ্কার!'

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আমার?'

'তোর পেটে জিলিপি, মনে ঢুকেছে সেই প্যাঁচ!'

'সে ঢুকুক, তোমার মাথায় ভাগাভাগি ঢুকল কী করে?'

মেজমামা বললেন, 'নিশ্চয় কোনো উকিলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। অসৎ সঙ্গে পড়েছে। দেখতে হবে না।'

মাসিমা বললেন, 'তুমি চুপ করো, আমি দেখছি। বড়দা, তোমার মাথায় পার্টিসান ঢুকলো কী করে?'

বড়মামা বললেন, 'যা হবেই, তা হইয়ে দেওয়াই ভাল। এ-কালে

ভাইয়ে ভাইয়ে মিল হতে পারে না। মুরারীদের বাড়ি পার্টিশান হয়ে গেল। রামুরা তিন ভাইয়ে মামলা লড়ছে। পাঁচ বছর হয়ে গেল। এই বাড়ি, সম্পত্তি, ঘটি, বাটি আমি সব তিন টুকরো করব।'

মেজমামা বললেন, 'তুমি তিনটুকরো করার কে? হু আর ইউ?'

বড়মামা বললেন, 'তোমরা সবাই শুনলে! বললে, হু আর ইউ! মায়ের পেটের দাদাকে কি হতচ্ছেদ্য! বলে কিনা হু আর ইউ?'

মেজমামা বললেন, 'আমি একটু কারেকসান করে দিতে চাই। মায়ের পেটের দাদা নয়, মায়ের পেটের ভাই। কেউ দাদা হয়ে জন্মায় না। জন্মে দাদা হয়, দাদাগিরি ফলায়।'

বড়মামা বললেন, 'আমি দাদা হতে চাই না। হু আর ইউ-এর উত্তর, আমি তোমাদের কেউ না।

আমি পথের মানুষ। পথেই জীবন, পথেই মরণ আমাদের।'

মেজমামা বললেন, 'দেখো, সেটা যেন সৎপথ হয়।'

'আমাকে উপদেশ করার অধিকার তোমার নেই। হু আর ইউ?'

মেজমামা মহানন্দ হাহা করে হেসে উঠলেন, 'কাটাকাটি হয়ে গেল। হু আর ইউ, হু আর ইউ-এ কাটাকাটি হয়ে গেল।'

মাসিমা বললেন, 'রক্তপাত হল না।'

বড়মামা বললেন, 'আমাদের ডাক্তারি ভাষায় একে বলে, ইন্টারন্যাল হেমারেজ। আরো মারাত্মক।'

মেজমামা শান্ত গলায় বললেন, 'আমাদের এত দিনের এই আনন্দ নষ্ট করতে চাইছ কেন?'

বড়মামা বললেন, 'আমার কাছের খবর আছে, তুই মোল্লার চকে একটা ফ্ল্যাটে বায়না করে এসেছিস।

'কে বলেছে?"

'যেই বলুক, আমার কাছে খবর এসেছে। অর্থাৎ, তুমি আলাদা হতে চাইছ!'

মেজমামা বললেন, 'আমার কাছে আরো সাংঘাতিক খবর আছে, তুমি উত্তর- পাড়ায় একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছ। পয়লা বৈশাখ

গৃহপ্রবেশ।'

বড়মামা অবাক, 'আমি ফ্ল্যাট কিনেছি! গৃহপ্রবেশ! কে বলেছে, হু ইজ হি? আই উইল কিল হিম জ্যান্ত, টুকরো টুকরো। মেক হিম কিমা। থোড়ের মতো থুড়ে দোবো। তার নাম বলো।'

মেজমামা বললেন, 'তোমাকে যে বলেছে তার নাম বলো। আমি তাকে হত্যা করব।'

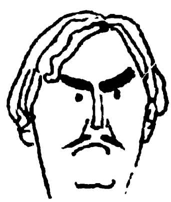
বড়মামা বললেন, 'গুরুদাস।'

মামা চিৎকার করে উঠলেন, 'গুরুদাস! ওই গুরুদাসই ত আমাকে বললে, তোমার দাদা ফ্ল্যাট কিনেছে, তাই কিনবেই! কত টাকা! রুগিমারা পয়সা!'

দুজনে একসঙ্গে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'গুরুদাস! স্কাউন্ড্রেল!'

মাসিমা চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'প্রত্যেকেরই ফার্স্টবুকটা ভাল করে পড়া উচিত,

॥ এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন, ক্লোজ টু মাই ফার্ম ॥



মৌনী মহেশ্বর

১

তিন দিন হয়ে গেল বড়মামার সঙ্গে কোনও কথাই বলা যাচ্ছে না। না, তিনি ব্যস্ত নন, তিনি মৌনী হয়ে আছেন। হিমালয় থেকে বরফের মতো এক সাধু মহারাজ এসেছিলেন সেদিন। আসা মাত্রই বড়মামা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, কারণ গত এক বছর ধরে তিনি বড়মামার শেষ



রাতের স্বপ্নে আসা-যাওয়া করছিলেন। সে-কথা বড়মামা আমাদের বলতেন। সেই স্বপ্নের মহারাজ রোজই আসতেন এক-একরকম জিনিস হাতে।

প্রথম দিন এসেছিলেন হাতে একটা বিরাট বড় গ্যাস বেলুন নিয়ে। সুতোটা ডান হাতের আঙুলে জড়ানো, বেলুনটা কাঁধের পাশ দিয়ে মাথার পেছন দিকে উড়ছে। টকটকে গেরুয়া রঙের একটা বেলুন। চা

খেতে-খেতে চায়ের টেবিলে সংবাদটি তিনি আমাদের ভেঙেছিলেন, অবশ্য যথেষ্ট ভূমিকার পর। ভালো স্বপ্ন, দিব্য স্বপ্ন কারওকে বলতে নেই। অ্যাকশান নষ্ট হয়ে যায়।

মেজমামা কায়দা করে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট খাচ্ছিলেন। কায়দাটা মাসিমার শেখানো। কায়দাটা শেখার আগে সারা টেবিলে গুঁড়ো ছড়িয়ে বিশ্রী একটা ব্যাপার করে ফেলতেন। আর নিত্য মাসিমার কাছে বকুনি। ইঁদুরের মতো না খেয়ে মানুষের মতো খেতে শেখো না। এতবড় একজন অধ্যাপক, সভ্যসমাজে মেলামেশা করো, অথচ ইউ ক্যান নট ট্যাকটফুলি ম্যানেজ এ সিম্পল ক্রিমক্র্যাকার বিস্কিট।

বড়মামার যেমন খুঁচিয়ে ঘা করা স্বভাব। সব ব্যাপারে কমেন্ট করা চাই-ই চাই। বড়মামা বলেছিলেন, ওটা সায়েবদের কাছে শিখতে হয় কুসী। বিস্কুট, কেক এসব সায়েবি জিনিস। কাকে কী বলছিস! তুই বরং ওর হাতে একটা ফুলঝাড়ু ধরিয়ে দে। বলে দে, খাওয়ার পর জায়গাটা সাফ-সুতরো করে দিয়ে যেতে, যাতে সভ্যমানুষেরা এসে বসতে পারে।

কোনও ঝগড়া নেই, অশান্তি নেই, মেজমামা নিঃশব্দে একটা বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'যদি দয়া করে দেখিয়ে দেন, সভ্যমানুষের বিস্কুট খাওয়ার সভ্য কায়দা!'

বড়মামা বিস্কুটটা স্মার্টলি নিয়ে সামনের দাঁতে কটাস করে কামড়ালেন এবং ফল! অতি শোচনীয়! বলা চলে মিজারেবল। ক্রিমক্র্যাকার, পাঁপর, নিমকি, খাস্তা-কচুরি, শনপাপড়ি এসব জিনিস যে কী সাংঘাতিক, সে, যে জানে সে জানে। বড়মামার সামনে টেবল ক্লথের ওপর ছড়িয়ে পড়ল টুকরোটাকরা। মেজমামার চেয়ে অনেক বেশি নোংরা করে ফেললেন। সিদ্ধান্তে এলেন, 'ভিজে দাঁতে খেলে তবেই হবে, অথবা বিস্কুটটাকে চায়ে ভিজিয়ে খেতে হবে।"

'ভিজে দাঁতটা কী জিনিস! ভিজে বেড়াল শুনেছি!' মেজমামার প্রশ্ন।

বড়মামার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর, 'একবার করে কুলকুচো একবার করে বিস্কুটে কামড়। খুব সোজা ব্যাপার। এক গেলাস জল নিয়ে বোসো, এক ঢোঁক এক কামড় বিস্কুট, এক চুমুক চা, আবার এক ঢোঁক জল,

এক কামড় বিস্কুট, এক চুমুক চা।'

'তার মানে, ঠান্ডা গরম, গরম ঠান্ডা এবং গো টু সিক বেড।' মেজমামা হাসতে হাসতে বললেন।

মাসিমা বললেন, 'দুটোরই মাথামোটা। কায়দাটা হল দাঁত তোলার সময় ডেন্টিস্টরা যে-কায়দায় চেয়ারে বসান, সেই কায়দায় মুখটা সিলিং-এর দিকে তুলে হাঁ করে বিস্কুটে কামড়, গুঁড়ো সব গলায়, এইবার ঘাড় সোজা করে চিবোও, এক ঢোঁক চা, আবার মুখ তোলো, ঘাড় হেলাও, মারো, কামড়, ঢালো চা।'

২

মেজমামা বার কয়েক অভ্যাস করে বললেন, 'ওয়ান্ডারফুল! কী টেকনিক শেখালি কুসী। তোর শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে চাকরি হওয়া উচিত। তোর এই কায়দা, ব্যায়াম কে ব্যায়াম, খাওয়া কে খাওয়া! টু ইন ওয়ান। স্পন্ডিলাইটিস ভালো হয়ে যাবে।'

তা সেই কায়দায় বিস্কুট ম্যানেজ করে মেজমামা স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে প্রশ্ন করছিলেন, 'হাতে বেলুন কেন?'

উত্তরটা মাসিমা দিলেন, 'বালককে বেলুনই উপহার দিতে হয়। বেলুন, বেলুন বাঁশি, সফ্‌টভলস।'

মেজমামা জিগ্যেস করলেন, 'দ্বিতীয় স্বপ্ন?'

বড়মামা বললেন, 'একটা কোদাল কাঁধে এসে আমার চারপাশে ঘুরছেন, আর গাইছেন,

চল কোদাল চালাই ভুলে মানের বালাই।'

মাসিমা বললেন, 'এর অর্থ হল। একটু উঠে হেঁটে খেটে খাও। দিন-দিন আয়েসি হয়ে পড়ছ। ধামার মতো ভুঁড়ি। নিচের দিকটা যেন আলুর বস্তা।'

মেজমামা বললেন, 'তৃতীয় স্বপ্ন?'

বড়মামা বললেন, 'কোলে একটা বাচ্চা হনুমান। হনুমানটা

দেখতে-দেখতে বিরাট একটা বীর হনুমান হয়ে গেল।'

মাসিমা বললেন, 'ওটা তুমি। শৈশবেও হনুমান. এখনও হনুমান। হনুমানের ধারাবাহিকতা।'

মেজমামা বললেন, 'চতুর্থ স্বপ্ন?'

'তিনি একটা ছবি দেখালেন, ছবিটা আমার। বেদিতে বসে আছি। হাজার-হাজার মানুষ আমাকে প্রণাম করছে। অর্থাৎ আমার ভবিষ্যৎ। সেই দলে তোরাও আছিস। কত বড় সৌভাগ্য যে আমি তোদের দাদা। গর্ব করে পরিচয় দিতে পারবি।'

সেই মহাপুরুষ হঠাৎ এসে হাজির। মেজমামা দেখা মাত্রই ফিসফিস করে বললেন, 'কুলফি মালাই।'

তাঁর শুনতে পাওয়ার কথা নয়, কী আশ্চর্য! মেজমামার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উপমাটা ঠিক হল না। কুলফিতে রং থাকে। বলো, আইসক্রিম।'

মেজমামা ঘাবড়ে গেলেন।

মহাপুরুষ বললেন, 'তুমি লোক ভালো, তবে একটু কৃপণ।'

'আমার একটু কাজ আছে' বলে মেজমামা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বড়মামা মৌনী। একটা কাগজে আমাকে লিখে জানালেন, 'জীবনে আর কথা বলব না।'

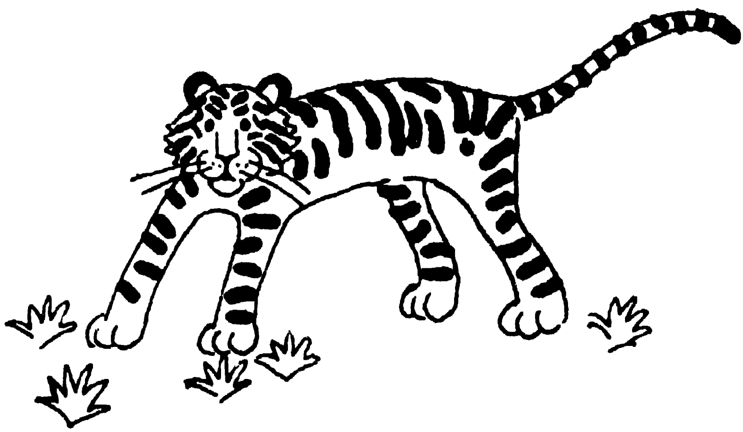
তিন চার দিন পরে লিখলেন, 'ভেতরে ভীষণ শক্তি জমছে।'

হঠাৎ দোতলায় ভীষণ শব্দ। দুমদাম। নিচের উঠানে দাঁড়িয়ে মাসিমার চিৎকার, 'আরে কে দরজা ভাঙছে।' দোতলার বাথরুম থেকে বড়মামার গলা, 'কোন মর্কট বাইরে থেকে দরজার ছিটকিনি আটকে দিয়েছে? কোন মর্কট!'

মেজমামা নাচছেন আর গাইছেন, 'দরজা নয়, দরজা নয়, মৌনী ভেঙেছে। হরি বোল হরি বোল শক্তি বেড়েছে।'

অঙ্কই ভগবান

'দুমাইলের মতো জঙ্গল। তারপর একটা মিষ্টি নদী। সুইট রিভার। তার ওপর বঙ্কুর মতো একটা সেতু। সেতু পেরলেই ছবির মতো সেই গ্রাম। কুতুবপুর। ইতিহাস। কুতুবুদ্দিন আইবক এই গ্রামের বটতলায় বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর যুদ্ধ নয় শান্তি। যুদ্ধ করবে বলবান গিয়াসুদ্দিন বলবন। মরুক বাঁচুক দেখার দরকার নেই আমার। মাথার টুপি খুলে



বাতাসে উড়িয়ে দিল। অলৌকিক ব্যাপার! টুপিটা পায়রা হয়ে উড়ে গেল নীল আকাশে। সেই থেকে পায়রার নাম হল কবুতর। সেই পায়রা দেড় মাইল দূরে যে-গ্রামে গিয়ে বসল, সেই গ্রামের নাম হল কবুতর গঞ্জ। যত ভাল ভাল পায়রা, বনেদী পায়রা একমাত্র ওই গ্রামে পাওয়া যায়। দেশবিদেশের শান্তি উৎসবে চালান যায়। অর্ডার আসে সেণ্ড আস এ পেটি অফ শান্তির শ্বেত পারাবত। কুতুবুদ্দিন বিরাট একটা মসজিদ তৈরি করলেন জরির কাজ করা। নাম হল ঝিলমিল মসজিদ। সেখানে

বসে বাকি জীবন শুধু গান লিখে নিজের সুরে গাইতে লাগলেন। সেই ধারার গানের নাম হল, কাওয়ালি।'

এমন একটা ঐতিহাসিক জায়গা। অবশ্যই যাব। যাবই যাব। কেউ আটকাতে পারবে না। আমি আর শঙ্কর রেডি। শঙ্কর শুধু সাহসী নয় দুঃসাহসী। ভূত ছাড়া কারোকে ভয় পায় না। টেরিফিক, ডেন্‌জারাস এই সব বিশেষণ-ওর জন্যেই তৈরি হয়েছে। কুতুবপুরেই শঙ্করের মামার বাড়ি। বড়মামা একসময় শিকারী ছিলেন। বেজায় বড়লোক।

মাইল দুয়েক ঘুটঘুটে জঙ্গল। বাঘ আছে। থাকা উচিত। বাঘ না থাকলে জঙ্গলের ইজ্জত থাকে না। শঙ্কর বললে, কোনো ভয় নেই, আজ শুক্রবার, বাঘদের ফাস্টেং ডে।

'কে বললে?'

'ব্যাঘ্র পুরাণে আছে।'

হাঁটছি, হাঁটছি। বিউটিফুল লাগছে। দুপাশে ছোলাখেত। কয়েক আঁটি ছিঁড়েছি। কাঁচা সবুজ ছোলা। ফ্যান্টাসটিক। জঙ্গল শুরু হল। প্রথমে পাতলা। তারপর দুপাশ থেকে চেপে এল। পথ বলে কিছু নেই। পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে মচমচ করে হাঁটছি। দুঃসাহসী সব গাছ চারপাশে। রোদ পড়ে আছে বাইরে।

হঠাৎ! যাঃ পথ নেই। পাহাড়ের গুহা হয়, এ দেখি বিশাল ঝোপের গুহা। জঙ্গলের টানেল। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঢুকব কি ঢুকব না! টলের মতো বড় বড় দুটো লাল আলো পাশাপাশি। ধক্‌ধক্ করছে। 'ওরে বাঘ রে!'

বাঘটা কি রকম একটা শব্দ করে বিশ্রীভাবে বেরিয়ে এল অসভ্যের মতো। পেছন ফিরে দে-ছুট করতে গিয়ে অবাক। পেছনে একটা বাঘ। ডান পাশে একটা, বাঁ পাশে একটা। চারটে কেঁদো, ঘিরে ধরেছে।

প্রথম বাঘটা একটা থাবা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টা বুক কাঁপান শব্দে প্রথমটার থাবাটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল। নিমেষে আমাদের দুজনকে নিয়ে চারটে বাঘের মধ্যে ঝটাপটি বেঁধে গেল—রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

আমরা পালিয়ে এলুম।

শঙ্কর বললে, 'কীভাবে বাঁচলুম বলতো?'

'ভগবান!'

'ধুত! অঙ্ক! ম্যাথেমেটিক্‌সের জোরে বাঁচলুম। চারটে বাঘ, দুটো মানুষ। চারটে বাঘ চারটে মানুষ হলে এতক্ষণে বাঘের পেটে। একটা বাঘ একটা মানুষ। ভাগের গোলমালে বেঁচে গেলুম রে। চারটে বাঘ দুটো মানুষ। চল, এবার অন্য পথে যাব। নদী পথে।'



আজও দাঁড়িয়ে আছি

শরৎ আর শীত এই দুটি ঋতু অতীতের ঢাকনা খুলে দেয়। যত বর্তমান সব অতীতের প্রান্তরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক জায়গা সেখানে। ওইটাই মনে হয় অনন্তের ঠিকানা। গত আর আগতের মাঝখানে বর্তমান একটা চৌকাঠ মাত্র। ভবিষ্যৎ বর্তমান টপকে অতীতের তেপান্তরে চলে যাচ্ছে। সেখানে মিঠে আলো, মিঠে রোদ। সংঘাতশূন্য মৃত্যুহীন একটা জায়গা। ভবিষ্যত বর্তমানে এসে মরে গিয়ে অতীতে চলে যায়।

শীত এসে উত্তুরে বাতাসে দক্ষিণের দরজা খুলে দেয়। অতীতের দরজা। যমের দক্ষিণদুয়ার। আমি এটা বেশ অনুভব করি। ক্রমশ ছোট হতে হতে শিশু হয়ে যাই। দুজন রমণী এসে দুপাশ থেকে আমার দুটো হাত ধরেন। একজন আমার মা, আর একজন আমার বড়মা। ছেলেবেলায় পরিবার পরিজনকে বলতে শুনেছি—দুজনেই ডাকসাইটে সুন্দরী। শিক্ষিতা। শিল্পকুশলী। দুজনেই সমান লম্বা, স্লিম।

আমার একটি হাত মায়ের হাতে, আর একটি হাত বড়মার হাতে। দুজনের পরিধানেই পিঙ্ক রঙের শিফন শাড়ি। থ্রিকোয়ার্টার হাতার ব্লাউজ। হালকা নীল কার্ডিগান। মাথায় সিল্কের স্কার্ফ। পায়ে ডোরা কাটা পাম শু। কানে দুলছে পেন্ডান্ট। গলায় সরু মফচেন। লম্বা, লম্বা ধবধবে সাদা আঙুল। দুজনেরই অনামিকায় লাল, টকটকে রুবির আংটি। আমরা তিনজনে শীতের রোদে মজা করে হাঁটছি। কখনো ঝুলে পড়ছি। কখনো তিড়িং করে লাফিয়ে উঠছি। পায়ের তলায় বাঁশপাতা মচমচ শব্দ করছে। বেশ কিছুটা দূরে আমার বাবা আর জ্যাঠামশাই গল্প করতে করতে হাঁটছেন। মাঝে মাঝে হাহা করে হেসে উঠছেন। প্রান্তরের নির্জনতায় দোলা লাগছে। দুজনেই কৃতী পুরুষ। পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আমরা সাঁওতাল পরগনার স্বাস্থ্যকর কোনো একটা জায়গায় বেড়াতে এসেছি। যেমন আসি প্রত্যেক বছর। অনেক কথা, গল্প, হাসি ফেলে রেখে যাই। নানা রঙের অদৃশ্য নুড়ি। অদৃশ্য কালপ্রবাহ তার ওপর দিয়ে বইতেই থাকবে। চড়া শীত তাই কড়া রোদ কমলালেবুর মতো মোলায়েম। দূরে বহু দূরে ধূসর পর্বত শ্রেণী আকাশ আটকে তরঙ্গের মতো বিস্তৃত। দুধারে মুংলি বাঁশের ঝাড়। বিশাল বিশাল ইউক্যালিপটাসের সার। সায়েবদের মতো গায়ের রঙ। তেলা মসৃণ। পাতায় পাতায় সুন্দর



গন্ধ। আর একটু এগোলেই সেই নদী। সূর্য নিয়ে ছুটছে। ছোট ছোট তরঙ্গভঙ্গে চিকির মিকির হাসি। নাকে আসবে জলের গন্ধ। শুকনো শীত ভিজে ভিজে হয়ে যাবে। নদীর বুক থেকে একটা আলো উঠে এসে আমরা মায়েদের মুখ দুটিকে উদ্ভাসিত করবে নামের নাকছাবির পাথর আভা ছড়াবে। আমি অবাক হয়ে দেখব দুজন মা দুর্গা নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে বহুরকমের পরিযায়ী পাখির হরেক ভাষার কলরব শুনছেন। সাদা, কালো, চকোলেট, কতরকমের রঙ, কতরকমের জলখেলা।

মা তাঁর দিদিটিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকবেন। কেন পাখিরা স্বদেশ ছেড়ে এই নির্জন বিদেশে চলে আসে? এখন এই বয়েসে আমি যেমন ওই দুজনকে প্রায়ই প্রশ্ন করি। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে আপনারাই বা কেন পরিযায়ী পাখির মতো অনন্তের আকাশে উড়ে গেলেন? হাসি-খুশি দুজন মানুষের জীবন থমকে গেল। রান্নাঘরে শ্মশানের নীরবতা নামল। জোড়া উনুনে নানা রকম রান্নার কেরামতি বন্ধ হল। ফুল বাগানে ফুল ফুটতে ফুটতে আর ফুটল না। আগাছার উল্লাস। সাজানো ঘরের সজ্জায় পাউডারের মতো ধুলোর স্তর জমতেই থাকল। বড়মার এস্রাজ, মায়ের হারমোনিয়াম পরিত্যক্ত বালিকার মতো পড়ে রইল একপাশে। কোনো রাতে হঠাৎ বেজে উঠল না আর। একটা একটা করে তার ছিঁড়তে লাগল আচমকা শব্দে। ছাতের তারে শুধু ঝোলে পুরুষদের জামা কাপড়। শীত এল বাসন্তী রঙের শাড়িগুলো গেল কোথায়? অতীত অতি অহঙ্কারী। বর্তমানের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না। মৌনী।

আমরা হাঁটছি। এবার নদীর কিনারা ধরে। ওদিকে একটা দেশ আছে চুনার। ঐতিহাসিক জায়গা। আমাদের লক্ষ একটি নীলকুঠি। ভেঙে-চুরে পড়ে আছে ইটে লেখা ইতিহাস। সার সার শ্যাওলা ধরা চৌবাচ্চা। যখন নীল হত তখন এই চৌবাচ্চায় ভেজানো হত। হাফপ্যান্ট পরা নীলকর সাহেব বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকত ওই জায়গাটায়। বিশাল একটা অশত্থ গাছ বাড়িটার মাঝখান থেকে সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। বসে আছে এক ঝাঁক টিয়া। মহা কলরব। একটা নৌকোর কঙ্কাল পড়ে আছে নদীর তীরে। আমার দুই মা হঠাৎ গান ধরলেন, রবীন্দ্রসংগীত। খালি নীলকুঠির ভেতর থেকে সেই গান প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগল। ছোট মায়ের কি আনন্দ! গান ছেড়ে কু কু করে চিৎকার করতে লাগলেন। বড়মা আদর করে পিঠে একটা কিল মেরে বললেন, 'তুই কি কোনদিন বড় হবি না?' ছোট মা বড়মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দিদি, তুমি বড় হও, আমি ছোটই থাকি।'

সেদিনও ছিল শীতের সকাল। খুব ভোর। চারপাশ ধোঁয়া ধোঁয়া।

রাস্তার আলো যেন নেশাখোরের চোখ। বড়মা দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তি। বিদায়! ছোট, বিদায়! ভাবিস না, তোর ছেলেটার জন্যে এখনো একজন মা রইল। একটি প্রদীপ তিন দিন জ্বলে রইল একটি নিরালা ঘরে। মানুষ প্রদীপ হয়ে যায়, তারপর উঠে যায় আকাশে-একটি তারা। যে চিনতে পারে, সে পারে। তিনটে বছর। বুঝতেই পারিনি, যে আমার ছোট মা নেই। আবার শীত! এবার সাঁঝবেলা। খেলার মাঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে কুয়াশা। বিশ্রী মেঘ মেঘ এক বিকেল। আমি বাড়ি যাব। কিছুতেই ওরা আমাকে যেতে দেবে না। আমি বন্দী না কি? মারামারি করে, আঁচড়ে কামড়ে ছিটকে চলে এলুম।

ঘর আছে। বড় মা নেই। কেউ নেই। এইবার আমার দাঁড়িয়ে থাকার পালা। আজও দাঁড়িয়ে আছি। নিরালম্ব দুটি হাত দুপাশে ঝুলে আছে। ধরার কেউ নেই।



হেডস্যারের জুতো

'হেড স্যার, হেড স্যার!'

হইচই পড়ে গেল। হেড স্যার আমাদের সরস্বতী পুজো দেখতে এসেছেন। এবারে একটু বেশি ঘটা। স্কুলের পুজোর পঞ্চাশ বছর। খুব ডেকরেশান হয়েছে। প্রত্যেকবার খিচুড়ি ভোগ হয়। আলুর দমের আলু হাফ সেদ্ধ। বোঁদের দানা শক্ত শক্ত, প্যাট-প্যাটে। এবারের ব্যবস্থা খুব ভাল। স্কুলের এক্সস্টুডেন্ট আমেরিকায় গেছে বিরাট চান্‌স পেয়ে। তার বাবা প্রথমে ভেবেছিলেন, কাগজে রঙ করে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেবেন, পরে মত বদলেছেন, সরস্বতী পুজোয় স্কুলের ছেলেদের আচ্ছা করে খাওয়াবেন। 'সারা বছর তোমরা পিঠে খাও, একদিন অন্তত পেটে খাও।' ভদ্রলোকের নাম, সুব্রত মৈত্র। স্টাউড চেহারা, খুব ফরসা। নাকের ডগায় ছোট্ট একটা আঁচিল। ভেরি বিউটিফুল। তাঁর ক্যাটারিং বিজনেস। বলেছেন, 'বিয়ে বাড়ির ভোজ খাওয়াব, বুফে সিস্টেম।' তাঁর ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানের নামটা খুব ইন্টারেস্টিং-'ধারাপাত'। পাত-শব্দটা আছে। পাত মানে পাতা। আর ধারাপাতে সব সংখ্যা। খাওয়াও সংখ্যা রাধা বল্লভী পেটে একটা গেল, দুটো গেল, সঙ্গে এন্ট্রি নিল ঘুগনি। অ্যায়! ফিশ ফ্রাই লাও! একের পরে দুই, দুইয়ের পরে তিন, আর না, আর না, লাগাও বিরিয়ানি। আনি নয়, দোআনি নয়, বিরিআনি। কিছু না মানি, মানি বিরিয়ানি। চাঁপ দিয়ে চেপে ধরো, কোঁত করে গিলে মরো।

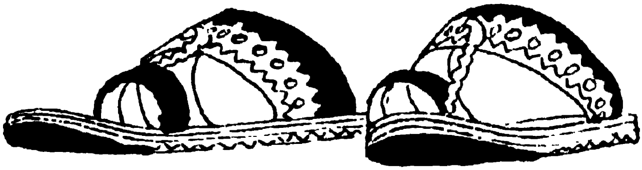
আমাদের নিউ হলে পুজো কমিটির মিটিং হয়েছিল—'ফিফটি ইয়ার্স অফ মা সরস্বতী।' মা সরস্বতী ইংরিজি উচ্চারণে একটু ডিফিকাল্ট। বলো ম্যা সোরোয়াস্বতী। স্বতী না শ্বেতী—এই নিয়ে কিছুক্ষণ ঝামেলা হল। শেষে সিদ্ধান্ত হল, শ্বেতী শব্দটা নট গুড, একটা স্কিন প্রবলেম—দ্যাটস হোয়াই স্বতী। পাঁচ দশ মিনিট সবাই প্র্যাকটিস করলেন—সোরোয়াস্বতী।

মা ক্রমশই ইংরেজ রমণী হয়ে উঠলেন। হেডস্যার বেশ জোর দিয়ে বললেন—শি ইজ ডিভাইন ম্যাম-দেবী সুরেশ্বরী...।

বাংলার স্যার বললেন—ওটা গঙ্গার দিকে চলে গেল—ভগবতী গঙ্গে। বলতে হবে—জয় জয় দেবী চরাচর সারে।

উঁহু উঁহু, মেক ইট ইংলিশ মিডিয়াম—জ্যা জ্যা দেয়াবী চোয়ারা চোয়ারা স্যারে।

বড্ড বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে স্যার-কি সব চেয়ার টেবল?



কান্ট্ হেলপ ইয়া!

সুব্রতবাবুর কোনো বিয়েবাড়িতে ক্যাটারিং আছে, অধৈর্য হয়ে বললেন, লেটস কাম ডাউন টু বিজনেস। প্রতিমা আমার ছেলে পাঠাচ্ছে আমেরিকা থেকে। অলরেডি পোস্ট করে দিয়েছে।

পোস্ট করে দিয়েছে মানে? অত বড় প্রতিমা। লেটার বক্সে ঢুকবে কী করে? হেডস্যার ভীষণ চিন্তিত!

সুব্রতবাবু বললেন মির‍্যাকল! যখন আসবে দেখবেন, ওদেশে বিজ্ঞান মানুষকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে—মার্সে, জুপিটারে, স্যাটার্নে!

সে পৌঁছক! দেব-দেবীও ওদিক থেকে এদিকে আসেন, বছর বছর আসেন।

জলপথে ফিরে যান। ইন ফ্যাক্ট ডিজল্ভ করে যান। পড়ে থাকে খড়কুটো, বাঁশ-বাখারি।

ছোট্ট একটা প্যাকেট আসবে—ইউ নো। জাস্ট ফুঁ দিয়ে ফোলাবেন,

ইয়া বড় ম্যা সোরোয়াস্বতী। পুজো শেষ, ফু-উ-উ-স, নো সোরোয়াস্বতী। কিপ ইট ইন আলমিরা। পুট ন্যাপথালিন অ্যারাউন্ড। পোকারা এতকাল বই কেটে এসেছে, বইয়ের দেবীকে বাগে পেলে কি যে করবে না করবে!

—অত লাইট ওয়েট বেদিতে স্থাপন করবেন কী করে?

—ঝোলাব। ঝুলিয়ে দোবো। সেন্টারের ওই পাখাটা নামিয়ে দিয়ে মাকে ঝুলিয়ে দোবো। পা দুটো ষ্ট্র্যাপ করে দোবো নিচের তক্তায়। সে আমি দেখিয়ে দোবো। নো প্রবলেম।

সেই আমেরিকান মা সরস্বতীতে পূজা হল না। পুরোহিত মশাই রেগে গিয়ে বললেন, 'সীমা ছাড়িয়ে যেয়ো না। দেব-দেবী নিয়ে ইয়ারকি চলে না। বুঝলে?'

লাস্ট মোমেন্ট প্রতিমা এল। তাড়াহুড়ো করে তৈরি। আধকাঁচা। কুমোরপাড়ার বিশুদার ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। বিশুদা আধুনিক রঙ চাপিয়ে বললেন, 'কোনো রকম ম্যানেজ করে দিলুম। সারারাত পাখার তলায় রাখবি।'

ভোরবেলা কেলেঙ্কারি কাণ্ড। মায়ের সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে থুক্থুক্ করছে। কাঁচা রঙে সব সেঁটে গেছে। বিশুদা শুনে খুবখানিক রাগারাগি করলেন, 'বলবি ত স্কুলে পিঁপড়ে আছে তাহলে রসগোল্লার রস মাখাতুম না।'

'রস মাখালেন কেন?

'রূপচর্চায় মেয়েরা মুখে সিরাপ মাখছে। রঙের কামড়ি বাড়াবার জন্যে এক কোট রস মেরেছিলুম।'

যাই হোক, পিঁপড়ে জড়ানো মাকে আবার রঙ করে কাপড়-টাপড় পরিয়ে সে একরকম হল। পিঁপড়ে গেল ত মাছি এল। একটা মাছি নাকের ডগায় বসেই রইল। মনে হয় আটকে গেছে। হিষ্ট্রির স্যার মাকে দেখে বললেন, 'অসাধারণ, বিশুর আইডিয়া, নাকের ডগায় নাকছাবি ফিট করে দিয়েছে। একেই বলে আর্টিস্ট! ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে এমন ব্যস্ত নাকছাবি নাকের মাথায় উঠে গেছে-খেয়াল নেই।'

অঞ্জলি শুরু হয়েছে, মন্ত্রোচ্চারণে হল গম গম করছে, এমন সময় হেড স্যার এলেন। আবার প্রথম থেকে অঞ্জলি শুরু হল—সরস্বতী মহাভাগে....। হেডস্যার এখন বেশিক্ষণ থাকবেন না। আরো তিনটে স্কুলে যেতে হবে। দুপুরে আসবে, খাওয়ার সময়। সুব্রতবাবু ফাটিয়ে রান্না করাচ্ছেন। একটাই দুঃখ শ্রাদ্ধবাড়ির খাওয়া। নিরামিষে কি আর খেলাব!

হেড স্যার বাইরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'যাঃ আমায় জুতো! নিউ পেয়ার অফ শু। এখানেও জুতো-চোর এন্ট্রি নিয়েছে!'

'স্যারের জুতো কে চুরি করবে?'

'করেছে, বলে কে করবে! নিঃশেষে চুরি।'

ধীরাজ হঠাৎ বলে বসল, 'স্নিফার ডগ আনলে কেমন হয়!'

হেডস্যার রেগেই ছিলেন, আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'ইয়ারকি হচ্ছে?' কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে?' আমরা কয়েকজন বাইরের রাস্তায় ইনভেস্‌টিগেসান-এ গেলুম। গোটা কতক তাগড়া কুকুর নিজেদের ঘেউ ঘেউ কাজে ব্যস্ত। জুতো নেই। কুকুররা আজকাল জুতো নিয়ে মাথা ঘামায় না।

হেডস্যার বললেন, 'এখানে ক'জোড়া জুতো আছে?'

শঙ্কর গুনে বলল, 'ফিফটি পেয়ারস।'

'সেই পঞ্চাশজনকে ডাকো।'

পঞ্চাশজন হাজির। হেডস্যার বললেন, 'যার যার জুতো পরে ফেলো।'

প্রত্যেক জুতো পায়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ালেন। পড়ে রইল এক জোড়া। পুরনো।

হেড স্যার বললেন, 'হুজ পেয়ার ইজ দিস! তার পায়েই আছে আমার জুতো।

আইডেন্টিভাই।'

জুতো পরীক্ষা হচ্ছে। ধীরাজ আমাদের শার্লক হোমস। সে হঠাৎ অবিষ্কার করলে জুতোর তলায় হলুদগুঁড়ো। মুখ তুলে বললে, 'সুব্রতবাবুর

জুতো।'

রান্না হচ্ছে, একেবারে শেষের দিকের একটা ঘরে। সুব্রতবাবু নিজেই কি একটা রাঁধছেন। ধীরাজের চোখ পায়ের দিকে, 'ওই দেখ। হেডস্যারের জুতো না হয়ে যায় না। ব্র্যান্ড নিউ।' ধীরাজই বললে, 'স্যার! আপনি হেডস্যারের জুতো পরে চলে এসেছেন।'

'অ্যা, সে কি! তাই ভাবছি, জুতোটা যেন এক সাইজ ছোট হয়ে গেছে। গোড়ালি বেরিয়ে যাচ্ছে। আসলে, আমি কখনো নিচের দিকে তাকিয়ে জুতো পরি না। পায়ে গলিয়ে চলে আসি। আমি কখনোই বলতে পারব না যে-এই জুতোটাই আমার!'

শালপাতার থালায় হেডস্যারের জুতো। থালাটা সুব্রতবাবুর মাথায়। নিউহলের সামনে গুঞ্জন 'জুতো আসছে, জুতো আসছে।'

পুরোহিত মশাই বাইরে এসে রাগ রাগ গলায় বললেন, 'তাহলে এবার জুতো পুজোই হোক মায়ের পুজো বন্ধ থাক।'

তাঁর কথা কেউ শুনতেই পেলেন না।

হেডস্যার বললেন, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। নিন, আপনার জুতোটা পরে নিন। ওই যে।'

পুরোহিতমশাই লাফিয়ে উঠলেন, 'তার মানে? আমার জুতো উনি পরবেন কেন?'

এদিকে হেডস্যারও লাফিয়ে উঠলেন। 'এ কি! এত আমার জুতো নয়। আমার ত ব্ল্যাক!

এ ত ব্রাউন!' সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন—'যা, আ, আ-।'

'শার্লক হোমস'-ধীরাজ পুরোহিত মশাইকে জেরা করছে, 'আপনার জুতোর তলায় হলুদ লেগে আছে কেন?'

'কাল একটা গায়ে হলুদ ছিল।'

হেড স্যার বললেন, 'মাথায় করে এটা তা হলে কার জুতো নিয়ে এলেন?'

সুব্রতবাবু বসে পড়েছেন— 'তাই ত ভাবছি!'

'আর ভেবে কী হবে—মাই জুতো ইজ গন। পাঁচশো টাকা।'

সুব্রতবাবু উঠে দাঁড়ালেন। নিজের মনেই বলছেন—'অঞ্জলির সময় এলুম। বেশ। তারপর জুতো গলালুম। রাইট। বাইকে চেপে সাধুখাঁদের বাড়ি। বিয়ে বাড়ি। জুতো খুলে ঢুকলুম। একটা কথা। ঝট্, বাইরে। জুতো। বাইক। ব্যাক। ইউরেকা! ইউরেকা! আপনার জুতো সাধুখাঁদের বাড়ির বারান্দায়। ধীরাজ। কাম উইথ মি, কাম, কাম।'

'এই জুতোটা নিয়ে যান।'

'না, না, ওটা থাক। আগে আপনারটা পাই কি-না দেখি, এ বার্ড হই হ্যান্ড ইজ ওয়ার্থ টু ইন দ্যা বুশ!'

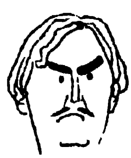
পুরোহিতমশাই নিজের জুতো পায়ে গলালেন। জুতোকে বলছেন—'খুব বেঁচে গেলি। চল, নিরাপদ জায়গায় রেখে আসি।'

হেডস্যার ব্রাউন জুতোয় পা গলিয়ে বললেন, 'বাঃ, হচ্ছে ত, বেশ হচ্ছে।

কমফার্টেবল, আমারটার চেয়েও ভাল। তাহলে ঘুরে আসি। দুটো স্কুল পথ চেয়ে বসে আছে।'

আমাদের আরতি শুরু হল। মাসিমা ভোগ নিয়ে আসছেন। প্রত্যেকবার ভোগের দায়িত্ব তাঁর। পাশেই বাড়ি। মায়ের সামনে ভোগ ধরে দিয়ে মাসিমা বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুবীর কোথায়? একটু আগে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল গরমমশলা দিতে। করেছে কি-আমার বড়ছেলের নতুন জুতো জোড়া পরে চলে এসেছে। ওরটা ছেড়ে রেখে এসেছে।'

অঙ্কের স্যার এতক্ষণ ঘটনার গতি রাখছিলেন, হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'অসম্ভব! এ পাজল-এর সমাধান নেই। তাহলে সুবীরের জুতোটা গেল কোথায়? সে তো খালি পা!'



আলোর নীচেই অন্ধকার

আমাদের স্কুলের ঘণ্টাটা একেবারে এক নম্বর। জাহাজে চেপে বিলেত থেকে এসেছিল। কুইন ভিক্টোরিয়ার উপহার। রানির রানিত্বের 'জুবিলি'তে আমাদের স্কুলের নাম বদলে রাখা হয়েছিল 'ভিক্টোরিয়া স্কুল'। বিরাট ঘটা হয়েছিল। বাজি পোড়ানো হয়েছিল। সেই সময়কার জাঁদরেল জমিদাররা দাঁড়িয়ে গেয়েছিলেন: 'রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস।' ঢ্যাং-ঢ্যাং করে যখন বাজে, গঙ্গার ওপারের স্কুলের ছেলেরা ছুটি হয়ে গেছে ভেবে হে-রে-রে-রে করে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সপাসপ। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে আবার ক্লাসে।

টিফিনের ঘণ্টা হল। পিল পিল করে সবাই মাঠে। মাঠের ওপরে দোতলার ঘরটা হেডস্যারের। পশ্চিমে খাড়া জানালা। ওপর দিকে তাকালে আমরা গোঁফ দেখতে পাই। রাগি গোঁফ।

আজ ওই ঘরে ভীষণ চেঁচামেচি হচ্ছে। হেডস্যার কেবল বলে চলেছেন, 'গেল কোথায়? কোথায় গেল!' আমরা সবাই হাঁ-করে ওপরদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বোঝার চেষ্টা করছি—কে গেল, কোথায় গেল! শাস্তির বহরটা কেমন হবে? নিল ডাউন, গাধার টুপি, বেত!

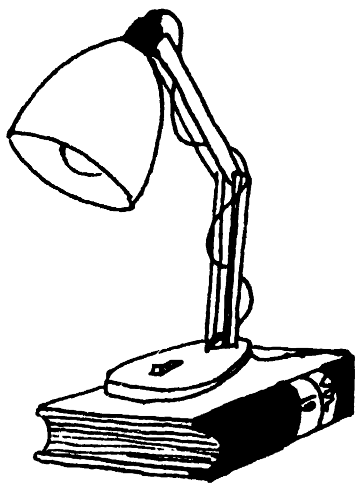
হেডস্যারের চিৎকার, 'কল এভরিবডি। প্রত্যেককে ডাকুন। কোথায় গেল, গেল কোথায়, কোথায় যেতে পারে?'

আমরা কয়েকজন পা টিপে টিপে দোতলায় উঠে স্যারের ঘরের বাইরে আড়ালে দাঁড়ালুম। স্যারেরা সব লাইন দিয়ে—ঘরের বাইরে, ঘরের ভেতরে। অর্থাৎ, লাইনটা যতটা পেরেছে ভেতরে ঢুকেছে, বাকিটা বাইরে পড়ে আছে। ভেতরে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথেমেটিক্স। বাইরে সব হিউম্যানিটিজ। সবচেয়ে করুন অবস্থা হিস্ট্রির। একেবারে শেষে।

অ্যালার্জির ধাত। ঘন ঘন হাঁচি। প্রাণখোলা উদাত্ত হাঁচি। প্রতিটি হাঁচির পরই বাংলাস্যারের সংযোজন 'বাপ্‌স।'

ইংরিজিস্যার বললেন, 'আপনার বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে চাকরি নেওয়া উচিত। নাক তো নয়, কামান! কাঁটাতারের একদিকে দাঁড় করিয়ে মুখটা ওদের দিকে ঘুরিয়ে দাও। সারাদিনে মোট কতবার দাগেন? হিসেবে রেখেছেন? ফ্রি ফায়ারিং।'

হাঁচিস্যার আর-একটা হাঁচি আসার আগে যে-টুকু বলতে পারলেন, 'প্রাচীন ধুলো আমার একেবারে সহ্য হয় না।'



'ধুলোর আবার প্রাচীন আধুনিক আছে নাকি?'

'ইতিহাসের বইয়ের ঐতিহাসিক ধুলো একবার নাকে ঢুকলে হয়!'

'বই নাড়ানাড়ির কী দরকার শুনি! নোটসেই যখন কাজ হয়ে যায়।'

গণিতস্যার *ঠেলেঠুলে* ঘরের ভেতর থেকে দরজায় এসে দাঁড়ালেন, হেডস্যারের মুখপাত্র। তিনি বললেন, 'আপনাদের কেউ যদি নিয়ে থাকেন, দয়া করে কবুল করুন। উনি বলছেন—তা না-হলে পুলিশ ডাকবেন।'

এ-দিক থেকে ফিজিক্‌সস্যার জানতে চাইলেন, 'জিনিসটা কী?'

গণিতস্যার জানেন না। ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘জিনিসটা কী?’

ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এলো : ‘ভল্যুম টেন।’

গণিতস্যার উত্তরটা ধরে নিয়ে বাইরে ছুড়ে দিলেন, ‘ভল্যুম টেন।’

‘কী ভল্যুম টেন?’

জানেন না। প্রশ্নটা ধরে নিয়ে ছুড়ে দিলেন ভেতরে।

হেডস্যার বেরিয়ে এলেন। রাগি মানুষ, আরও রেগেছেন। ফর্সা গোল মুখ টকটকে লাল।

বাংলাস্যার বললেন, ‘শুনুন, ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’ ভল্যুম টেন—কে নিয়েছেন কবুল করুন। কার কাজ?’

স্যারদের মধ্যে থেকে কেউ বললেন, ‘সাইকেল হলে কথা ছিল, এ হল সাইক্লো।’

ফিজিক্সস্যার বললেন, ‘যার কাছে চাবি, সেই নিয়েছে।’

হেডস্যার প্রশ্ন করলেন, ‘কার কাছে চাবি?’

প্রশ্নটা বাইরে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর শোনা গেল, ‘চাবি পাঁচুবাবুর কাছে থাকাই স্বাভাবিক।’

হেডস্যার রেগে আছেন, তাই বললেন, ‘সেই ভদ্রমহোদয়কে একবার ডাকা যেতে পারে কি?’

পাঁচুবাবু, আমাদের পাঁচুদা এলেন। ভীষণ ভালোমানুষ। আমরা বলি, ছাত্রবন্ধু। গোলগাল ফানুসের মতো চেহারা। সব সময়েই কিছু-না-কিছু একটা খাচ্ছেন। পাশ দিয়ে যখন চলে গেলেন, আমরা তালের বড়ার গন্ধ পেলুম। কাল জন্মাষ্টমী ছিল। বাড়ি থেকে টিফিন কৌটো ভর্তি করে এনেছেন। হেডস্যারের সঙ্গে কথোপকথন—

‘আলমারির চাবিটা কার কাছে?’ হেডস্যারের প্রশ্ন।

‘আপনার কাছে।’

‘তার মানে আমি চোর?’

‘চোর হতে যাবেন কেন? আপনি চাইলেন, আমি পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবিটা বের করে আপনার হাতে দিলুম।’

'পকেটটা দেখুন।'

'সে দেখছি। এই তো!'

'গোল মতো ওটা কী—বেরিয়েই ঢুকে গেল!'

'আজ্ঞে, ও একটা জিনিস।'

'জিনিসটা কী? জিনিসটার ডেফিনিসান কী?'

'আজ্ঞে চাবি নয়।'

'দেন হোয়াট?'

'তালের বড়া। নন্দ নাচিতে লাগিল।'

'পাঞ্জাবির পকেটে তালের বড়া? আর ইউ ম্যাড?'

'দিচ্ছিল না। ঝট করে এক মুঠো তুলে পকেটে পুরে হাওয়া। কাল জন্মাষ্টমী ছিল স্যার। বাড়িতে গোপাল আছেন। ইটার্নাল নটি বয়। আমি তার নটি ফাদার!'

'ভল্যুম টেন গেল কোথায়?'

'কীসের ভল্যুম টেন?'

'আলমারির দিকে তাকান—একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছেন? ব্রিটানিকা'র ভল্যুম টেনটা নেই? নেই কেন!'

'তা তো বলতে পারব না স্যার। বড় বড় লোকের বাড়িতে ওই বই সাজানো থাকে। কেউ পড়ে না। তিনদিন আগে আলমারির চাবিটা আপনি কী কারণে নিলেন? সেটা গেল কোথায়? মনে করার চেষ্টা করুন। চেয়ারে বসে ধ্যান করুন। এত উত্তেজিত হন বলেই আপনার কিছু মনে থাকে না।'

'মনে থাকে না?'

'না, থাকে না। আপনি একবার থার্মোমিটার বগলে স্কুলে চলে এসেছিলেন। আর বলছিলেন—হাতটা তুলতে পারছি না। মনে হচ্ছে কী-যেন একটা রয়েছে, পড়ে যাবে।'

'আগে আমার মুখে থার্মোমিটার দিত, পর পর দুটো চিবিয়ে ফেলার পর এখন বগলে দিয়ে বলে—চেপে থাকো। আমার সেদিন তাড়া ছিল। কুক্ষিগত থার্মোমিটার নিয়ে চলে এসেছি। ভুল সকলেরই হয়। আপনার

হয়, আপনাদেরও হয়। আপনাদের কাছে অনুরোধ, সেটটা নষ্ট হয়ে যাবে, দয়া করে উদ্ধার করে দিন। আর সহ্য করতে পারছি না এই তালের বড়ার গন্ধ। লোকে গন্ধ মাখে, ইনি তাল মেখে চলে এলেন।'

পাঁচুদা বড় বড় চোখে হেডস্যারের টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ না-সরিয়ে বললেন, 'খুঁজে দিতে পারি, কী খাওয়াবেন?'

'যা খেতে চাইবেন।'

'ফুচকা।'

সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আঃ! ফুচকা!'

পাঁচুদা ধীরে ধীরে—বাঘ যেভাবে শিকারের দিকে এগোয় অথবা বেড়াল যেভাবে এগোয় অন্যমনস্ক পাখিদের দিকে—সেইভাবে এগোচ্ছেন হেডস্যারের টেবিলের দিকে। টেবিলল্যাম্পের তলায় একটা মোটাসোটা বই।

'হোয়াট ইজ দিস?'

হেডস্যার লাফিয়ে উঠলেন, 'ওই তো ভল্যুম টেন! ওখানে আলোর তলায় গেল কী করে! ল্যাম্পটা ওর ওপর চেপে বসল কী করে?'

'আজ্ঞে! চিরকালের সেই প্রবাদটা যে কত সত্য, তা আর একবার প্রমাণ করার জন্যে—আলোর নীচেই থাকে অন্ধকার।'

বিখ্যাত ঘণ্টার বিপুল শব্দ।

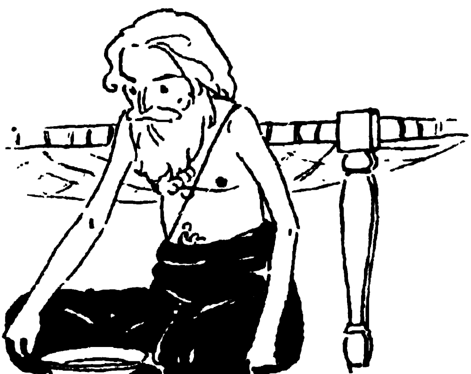
'যান, যান। সব ক্লাসে যান।'

'ভালো করে শুনুন স্যার—এ হল ছুটির ঘণ্টা। ফুচকার ঘণ্টা!'



অংশীদার

গণেশ আমার ব্যবসার পার্টনার। জ্যাঠামশাই তখন ঠিকই বলেছিলেন, দ্যাখো, জগন্নাথ, বেকার থাকা তবু মন্দের ভালো, কিন্তু পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে যেয়ো না, মরবে। বাঙালির পার্টনারশিপ টেকে না। বাঙালির স্বভাব অতি সাংঘাতিক দুজন বাঙালি যদি নৌকো চেপে সমুদ্র পাড়ি দিতে যায়, তো একজন যখন ঘুমোবে আর-একজন তখন নৌকোর



তলা ফুটো করবে। ভরাডুবি হয়ে জেনেও এই কাজ করবে।

জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনিনি। না শুনে আমার আজ এই হাল।

হেলেন অ্যান্ড ক্রসবি কোম্পানির ফুটপাথে চোপসানো বেলুনের মতো দাঁড়িয়ে আছি। হাতে সাত হাজার টাকার বিল। নাচতে-নাচতে এলুম, টাকাটা আদায় হলে লিলিকে বলেছিলুম কাশ্মীরে গিয়ে ফুর্তি করব। অ্যাকাউন্টেন্ট বললেন, 'কতবার টাকা নেবেন মশাই? তিনদিন আগে আপনার পার্টনার এসে টাকা নিয়ে গেছে।'

'নিয়ে গেছে মানে? এই তো বিল আমার কাছে, টাকা আমার পার্টনারের কাছে? অলৌকিক ব্যাপার।'

'অলৌকিক-ফলৌকিক বুঝি না মশাই, এই দেখুন ফাইল। এই দেখুন আপনাদের কোম্পানির স্ট্যাম্প মারা রিসিটেড বিল, আমাদের চালান।'

চোখ ছানাবড়া। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উদাস মুখে সিগারেট খাচ্ছি। ট্রাম যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, লোকের স্রোত বইছে। হাইহিল জুতো পরে মাথায় ফুলেল ছাতা মেলে হেলেদুলে এক মেমসাহেব চলেছে। কোনও কিছুই মনে ধরছে না। এই অবস্থায় আমাকে কেউ দেখলে বলত—জগন্নাথটা উল্লুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'হারামজাদা!'

পাশ দিয়ে চাপ-চাপ দাড়িওলা একটা গুণ্ডামতো লোক যাচ্ছিল। ততটা খেয়াল করিনি। লোকটি ঝপাত করে থেমে পড়ল। 'আমাকে বললেন?'

'আজ্ঞে না, আপনাকে এসব বলব কেন?' মনে-মনে খুব ভয় পেয়ে গেছি।

'তবে কাকে বললেন?

'আজ্ঞে, আপনার পার্টনার গণেশকে।'

'কেন? উলটে গেছে?'

'আজ্ঞে না, নিজে সোজা আছে, আমাকে উলটে দিয়েছে।'

'সিগারেট আছে?' লোকটি একটা সিগারেট চাইল। সিগারেট আর নস্যি একা ভোগ করার উপায় নেই। ভাগীদার জুটবেই। সিগারেট ধরিয়ে লোকটি বললে, 'শালা!'

'কে, আমি?'

'না, না, আপনি কেন শালা হতে যাবেন? আমার রিয়েল শালা, বউয়ের ভাই পঞ্চানন।'

'শালা তো শালা হবেই।' স্বস্তির গলায় বললুম।

'আরে না মশাই, না, এ-শালা হল সেই শালা।' ভীষণ রেগে গেছে লোকটি। একটানে সিগারেটের আধখানাই পড়পড় করে পুড়ে গেল।

'মানে, সেই ইতর শালা!'

'ইতর! চামার শালা।'

'কী করেছেন পঞ্চাননবাবু?' ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলুম।

'আর বাবু বলে সম্মান করতে হবে না। বলুন, পঞ্চাশালা।'

'আপনার শ্যালক হলেও, আমার তো নয়। কী করে বলি, বলুন?'

'আরে মশাই, ও হল সব শালার শালা!'

'কী করেছেন তিনি?'

'তিনি আমার স্ত্রীর নেকলেস নিয়ে হাওয়া মেরেছেন।'

'ছিনতাই?'

'না, না, ছিনতাই নয়, চোরের ওপর বাটপাড়ি। নেকলেসটা হাতসাফাই করে ওর হাতে দিয়েছিলুম ঝেড়ে দেওয়ার জন্যে। পৃথিবীটা শালা পালটে গেছে। কারোর মধ্যে একটুকু সততা নেই, অনেস্টি নেই। বিশ্বাসের দাম দিতে জানে না। বিশ্বাসঘাতকের দল!'

'স্ত্রীর গয়না হাতসাফাই করাটা খুব ভালো কাজ নয়, ইয়েবাবু।'

'ইয়েবাবু নয়, পলটুবাবু।'

'হ্যাঁ, পলটুবাবু। ওটা খুব নোংরা কাজ, নীচ কাজ।'

'আপনাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না! কী বাবু?

'জগন্নাথবাবু।'

'হ্যাঁ, জগন্নাথবাবু। ওসব জ্ঞানের কথা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগেই মানায়। স্ত্রীলোকে গয়না পায় স্বামীর দৌলতে। আমি আমার বউকে বিয়ে করেছিলুম বলেই আমার শ্বশুরমশাই ধারদেনা করে দশ ভরি গয়না দিয়েছিলেন। বিয়ে না করলে মেয়েকে গয়না দিতেন? গবেট।'

'কে গবেট?'

'আপনি, আবার কে? যাক, আলাপ যখন হয়েই গেল, তখন চলুন, কোথাও বসে চা খাওয়া যাক। আগেই বলে রাখছি, তিনটের পর আমি শুধু চা খেতে পারব না। মোগলাইটোগলাই চাই। পকেটে সেরকম মালকড়ি আছে তো?'

বেশ মজার লোক। নিজের দুঃখে এতক্ষণ খুব কাবু-কাবু লাগছিল।

এই লোকটিকে পেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। দুঃখ ভাগ করে নিতে পারলে, সেই প্রবাদের মতো, একের বোঝা দশের লাঠি।

কাঠের কেবিন। ঘ্যানঘ্যান করে একটা কেবিন-ফ্যান ঘুরছে। চারটে পায়া থাকলেই যদি টেবিল হয়, তাহলে সেইরকম একটা টেবিলের দু-পাশে দুটো চেয়ার। চটচটে একটা মরিচ আর একটা নুনদানি। আবার একটা পরদাও ঝুলছে। মেয়েছেলে-ফেয়েছেলে নিয়ে কেউ এলে, ওই ময়লা-ময়লা পরদাটা ঝড়াং করে টেনে দিলেই আড়াল তৈরি হবে। পাশের কেবিনটার পরদা টানা রয়েছে। মাঝে-মাঝে চুড়ির কিনিকিনি শোনা যাচ্ছে।

বয় এসে দাঁড়াতেই আমাকে আর অর্ডার দিতে হল না। পলটুবাবুই হুকুম জারি করলেন, দুটো মোগলাই, একটায় ডবল ডিম আর মাংসের কিমা, বেশি পেঁয়াজ আর আদা-কুচি। বয় চলে গেল। পলটুবাবু বললেন, 'আপনারটা লাইটই থাক। বলা যায় না, পেটে সহ্য হবে কি হবে না।'

পলটুবাবু গেলাসে চুমুক দিলেন। অল্প একটু জল খেয়ে বললেন, 'চোখের সামনে দিয়ে সিলভার অ্যারো বেরিয়ে গেল, কিচ্ছু করতে পারলুম না। ইস, ইস! শালা আমাকে হেল্পলেস করে দিলে!'

'সিলভার অ্যারো? সেটা আবার কী?'

'আরে ঘোড়া, মশাই, ঘোড়া। ব্যাঙ্গালোর রেসে শনিবার দৌড়চ্ছে। ভেবেছিলুম, ট্রিপলটোটে খেলে একটা নেকলেস দুটো করে আনব। শালা পথ মেরে দিলে। সেই বউই ভালো, যে বউতে শালা নেই।'

'আপনি রেস খেলেন? রেসে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়।'

'তা হয়। আমিও হয়েছি। তবে জেদ চেপে গেছে। ঘোড়ার লাগাম আমি ধরবই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। কী অমন জন্তু, মশাই! মেয়েছেলে নাকি? সারা জীবন ছলনা করে যাবে। মানুষ বলবে দেবা না জানন্তি কুত মনুষ্যাঃ ওই তো চারটে পা, একটা ল্যাজ, পিঠে একটা জকি। কতকাল ছলনা করবে? আমি শেষ রাতে স্বপ্ন পেয়েছি—সিলভার অ্যারো, সিলভার অ্যারো।'

মোগলাই এসে গেল। পলটুবাবু ছুরি আর কাঁটা নিয়ে ডিশের ওপর

হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। একটা বড় মাপের টুকরো মুখে পুরে বললেন, 'আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু, বিপদে-আপদে। আপনার কেসটা কী?'

'আমার কেস, ওই বাঙালির পার্টনারশিপ। একটা ব্যবসা করেছিলুম। গণেশ আমার ওয়ার্কিং পার্টনার। বেটা খুব বেগোড়বাই করছে। টাকা-ফাকা সরাচ্ছে। কিছু বলতে গেলেই চোখ রাঙায়। ভয় দেখায়। মহা ফাঁপরে পড়ে গেছি।'

'মালটাকে হাটান না, হাপিস করে দিন।'

'হাপিস মানে?'

'গুম করে দিন। লোকটা ছিল, লোকটা আর নেই।'

'মার্ডার?'

'মার্ডার-ফার্ডার জানি না। মাল চৌপাট।'

'কীভাবে?'

'ও অনেক রাস্তা আছে। আমার গুরু জানে।'

'রেসের গুরু?'

পলটুবাবু ছুরি দিয়ে প্লেটের গায়ে ট্যাং-ট্যাং করে শব্দ করলেন। বয় এসে দাঁড়াল।

পেঁয়াজ আনো।'

বয় চলে যেতেই পলটুবাবু বললেন, 'গুরু আমার নাম্বার ওয়ান, আইন জানে, ক্যারাটে, কুংফু জানে, ভালো ডাক্তারের মতো ছুরি চালাতে জানে। কী রকম চোট দিয়েছে?'

'এই মাত্র সাত হাজার।'

'সাত হাজার? কোনও মানে হয়? সাতবার একুশটা ঘোড়া ছোটানো যেত! মালটাকে জোটালেন কোত্থেকে?'

'জুটে গেল! এখন আর নামতে চাইছে না। ব্যবসা থেকে আমাকেই আউট করে দেবে দেখছি। কোর্টকাছারি কে করবে? আইন দিয়ে হাটাতে গেলে অনেক টাকার ধাক্কা। কারবার লাটে উঠে যাবে।'

পলটুবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কোর্টকাছারি ছাড়াও অন্য রাস্তা

আছে। ধোলাই।'

'কে ধোলাই দেবে? আমার ক্ষমতা নেই।'

'কাপড় ধোলাই করার যেমন লোক আছে, মানুষ ধোলাই করারও তেমনি লোক আছে।'

'তাতে তো আর টাকা ফিরবে না, জোচ্চুরিও বন্ধ হবে না।'

'তাহলে মালকে পগার পার করে দিতে হবে।'

'মার্ডার?'

'মার্ডার আবার কী? আজকাল মার্ডার বলে কিছু নেই, যাকে পারো ধরো আর মারো।'

'না মশাই, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই—সাত হাজার গেছে, আরও হয়তো যাবে। যায় যাক।'

'যায় যাক বলে কোনও শব্দ আমার ডিকশনারিতে নেই। ইউ আর মাই ফ্রেন্ড। গণেশের পেট আমি ফাঁসাবই। ছুরি দিয়ে নয়, দৈব দিয়ে।'

'মাদুলি-ফাদুলি?'

'বাণ মেরে। বাণ মেরে শুকিয়ে দেব। দিন-দিন মরা কাঠের মতো চেহারা হয়ে যাবে।'

'ধ্যুস, ওসবে আমরা বিশ্বাস নেই!'

'বিশ্বাস নেই?' পলটুবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'হিন্দুর ছেলে ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস নেই! কী আমার সায়েব রে!'

'নেই তা কী করব?'

'এখুনি বিশ্বাস হবে। এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, আপনি তো তুচ্ছ, আপনার বাবারও বিশ্বাস হবে।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে আবার আমরা রাস্তার। অফিস-ভাঙা ভিড় বাসে-ট্রামে। পলটুবাবু বললেন, 'একটা সিগারেট ছাড়ুন। খুব খাইয়েছেন, মশাই। পৃথিবীতে সাধুও যেমন আছে, শয়তানও তেমনি আছে! মিলেমিশে এই জগৎ। আপনার মনটা বেশ ভালোই।'

সিগারেট ধরিয়ে ভুস করে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন।

'নিন, চলুন। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। দু-শালাকেই যমের বাড়ি

পাঠাব। পঞ্চা আর গণশা। নেকলেস, আর সাত হাজার। হজম করতে দেব না।'

'কোথায় যাবেন?'

'সিরিটি।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'কাছেই। বাসে ঘণ্টা-দেড়েক লাগবে।'

'সিরিটি যাব কেন?'

'সেখানে আমার গুরুর আশ্রম। মহাশ্মশানের পাশে। তান্ত্রিক। মন্ত্র পড়ে একটা জবাফুল মাটিতে ফেলে দেবেন, আকাশ থেকে হুড়মুড় করে প্লেন ভেঙে পড়বে, ব্রিজ থেকে ট্রেন ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে, শোওয়ার ঘরে খাটের তলায় দপ করে আগুন লাফিয়ে উঠবে, সিলিং থেকে ফ্যান খসে পড়বে মাথার ওপর, আলমারির তলা থেকে সাপ বেরোবে ফোঁস করে। যখন যেখানে যা দরকার, ঠিক তাই ঘটে যাবে। চলুন, চলুন, আর দেরি না।'

গণেশের ওপর আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছিল। ধরে এনে ব্যবসায় ভেড়ালুম। তিন বছর না যেতেই বিয়ে করে বসল। বাঙালির ছেলে বিয়ে করে সায়েবদের মতো হনিমুনে গেল—কুলু, মানালি, কত কী! তখন কি জানতুম ছাই, আমারই ট্যাঙ্ক ফুটো করে বাবুর লপচপানি। আদুরে বউকে নিয়ে দেড় মাস আদিখ্যেতা। দেখাই যাক না, কী হয়। গণেশকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। তা না হলে সারা জীবন জোচ্চুরি করে যাবে। আজ আমার সঙ্গে, কাল রামের সঙ্গে, পরশু হরির সঙ্গে।

ভাবতে-ভাবতে বাস এসে পড়ল। পলটু 'উঠুন, উঠুন' করে ঠেলেঠুলে উঠিয়ে দিলেন।

সিরিটি জায়গাটা আদি গঙ্গার ধারে। কলকাতার এত কাছে এমন একটা অদ্ভুত জায়গা আছে, আমার জানাই ছিল না। পলটুবাবুর গুরুদেবের আশ্রম একেবারে নদীর ধারে। ঢালু জমি আশ্রমের পেছন দিকে গড়িয়ে নেমে গেছে মজা নদীর দিকে। সেখানেই শ্মশান।

আধপোড়া মৃতদেহ এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। সন্ধে হয়ে এসেছে। গোটাকতক শেয়াল সেই বীভৎস জায়গায় খ্যা-খ্যা করছে। কালো-কালো কুকুর ঘুরছে। জ্বলজ্বলে চোখ। চারপাশে পচা গন্ধ। বিশাল একটা বটগাছ। তলাটা অন্ধকার। বাঁধানো বেদি। মাঝে-মাঝে কালপেঁচা ডেকে উঠছে। একটা দুটো করে বাদুড় ডাল থেকে খসে পড়ে সুইস-সুইস শব্দে আকাশের দিকে উড়ে চলেছে। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো।

একটা একতলা কোঠাবাড়ি। বাইরে থেকে দেখলে আশ্রম বলে মনে হওয়ার কথা নয়। সামনেই উঁচু রোয়াক। পথ পাশ দিয়ে ঘুরে গা-ছমছম করা বটতলার অন্ধকার পেরিয়ে পেছনে আদিগঙ্গার ঢালে গিয়ে পড়েছে। বটতলায় দাঁড়িয়ে আছেন মা ছিন্নমস্তা। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। এক হাতে নিজের মুণ্ড, কাটা গলা দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত উঠে মুখে ঢুকছে। নিজের রক্ত মা নিজেই পান করছেন।

পলটুবাবুর সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হল। ভেতরে উঠোন। উঠোন ঘিরে উঁচু দালান। টকটকে লাল রঙের মেঝে। সারি-সারি বড়-ছোট ঘর। একটি মেয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছিল। শ্যামবর্ণা, কিন্তু ভারি মিষ্টি চেহারা। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'উনি এখন বিশ্রাম করছেন একটু। আজ অমাবস্যা। সারারাত পুজো আছে তো।'

পলটুবাবু বললেন, 'তা থাক। আমাদের খুব জরুরি দরকার। বেশি দেরি করলে গুরুজির পাওয়ারের বাইরে চলে যাবে। গুরুজি—গুরুজি! আমরা এসে গেছি।'

পলটুবাবুর দাপট কম নয়। গটগট করে দালান পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বললেন, 'চলে আসুন না। ভয় পাচ্ছেন কেন?'

প্রথম যে-ঘরটা, সেটা বোধহয় ঠাকুরঘর। বেড় বড়। ধূপধুনো, ফুল-বেলপাতা সব মিলেমিশে কেমন একটা গন্ধ তৈরি হয়েছে। একপাশে উঁচু বেদিতে তারা মূর্তি। বিশাল একটা প্রদীপ জ্বলছে থিরথির

করে। সামনে আসন পাতা। চারপাশে ছড়ানো পূজার জিনিস।

ঘর পেরিয়ে ঘর।

'গুরুজি! গুরুজি!'

ভেতর থেকে ভেসে এল গম্ভীর গলা 'অসময়ে কেন?'

'বিপদে পড়ে গেছি, গুরুজি।'

লাল টকটকে চেলি পরে গৌরবর্ণ এক বৃদ্ধ একটি খাটে শুয়ে আছেন। খোলা গা। লাল পইতে। মুখটি বেশ প্রসন্ন ও উজ্জ্বল।

'তোর তো পদে-পদেই বিপদ। সঙ্গে আবার কাকে নিয়ে এলি?"

'আমার এক বন্ধু। দুজনেই বিপদে পড়েছি।'

'কী বিপদ?'

মেঝেতে দুজনে বসে পড়লুম। পলটুবাবুই সব বললেন। নেকলেস হাতিয়ে শ্যালক বেপাত্তা সাত হাজার মেরে আমার পার্টনার হাওয়া।

গুরুজি সব শুনে বললেন, 'আমার কী করার আছে? আমি আমার সাধনভজন নিয়ে একপাশে পড়ে আছি। তোদের এসব ছ্যাঁচড়া ব্যাপারে আমি কী করব?'

'গুরুজি, সেবার আপনি জগাইকে সাত মাস হাসপাতালে ফেলে রেখেছিলেন।'

'কোন জগাই?'

'ওই যে আমার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে। আমাকে একদিন ধরে খুব ধোলাই দিয়েছিল।'

'বারবার ওসব কাজ হয় না রে, পলটু। তা ছাড়া, এই কিছুদিন আগে আমি একটা বড় কাজ করেছি। এখন কিছুদিন বিশ্রাম চাই।'

'কী বড় কাজ গুরুজি?'

'একটা বিমান দুর্ঘটনা, আর-একটা ট্রেন দুর্ঘটনা। আমার বহুত শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। এখন মাস-তিনেক আমাকে ক্রিয়াকলাপ করতে হবে।'

'ও দুটো কাজ কেন করলেন, গুরুজি?'

'প্রয়োজন ছিল।'

পল্টুবাবু, ঘষটে-ঘষটে গুরুজির খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে পা দুটো

জড়িয়ে ধরল, 'সামান্য কাজ, গুরুজি। এ তো আপনার কাছে ছুঁচো মারা।

'একটা নেকলেস আর সাত হাজার টাকার জন্যে জ্বলজ্যান্ত দুটো লোককে মেরে ফেলব, শুয়োর?'

'পাপের শাস্তি, গুরুজি। গীতাতেই তো আছে, বিনাশায় চ দুষ্কৃতকারিণাং।'

'তোরা কী এমন সুকৃতি করেছিস?'

'আমি না হয় বদ, গুরুজি, কিন্তু আমার বন্ধু! পার্টনার মেরে ফাঁক করে দিচ্ছে।'

'তাতে তোর কী রে, শালা?'

'পরের দুঃখে আমার মন যে কাঁদে।'

'আহা! আমার শ্রীচৈতন্য রে!'

পলটুবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা। পা ধরে ঝুলোঝুলি। আমি একবার ফিসফিস করে বললুম, 'ছেড়ে দিন না, মশাই। যা হাওয়ায় তা হবে। নিজেরা বোকা বনেছি, বোকাই থাকি। পরের অনিষ্ট করে কার কী লাভ হবে।'

'কী যে বলেন? অন্যায় যে সহে, অন্যায় যে করে তব ঘৃণা তারে যেন...।

'সে তো ঈশ্বরের ঘৃণা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই ঘৃণা, সেই শাস্তিই তো গুরুদেব নামিয়ে আনবেন।'

গুরুজি এতক্ষণ শুয়ে শুয়েই কথা বলছিলেন। এইবার ধীরে-ধীরে উঠে বসলেন পা দুটো খাট থেকে নেমে এসে ঝুলতে লাগল, ড্যাং ড্যাং করে। বেশ গোলমাল বেঁটেখাটো চেহারা। গুরুজি হঠাৎ ডাকতে শুরু করলেন, 'মায়া—মায়া!'

সেই মেয়েটি ঘরে এল। আমার এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ে হলে হয়ে যেত। বউকে খাওয়াবার মতো পয়সাকড়ির অভাবে আইবুড়ো কার্তিক হয়ে বসে আছি। এই তো সবে লিলি বলে একটা মেয়েকে নাড়াচাড়া করে দেখছি। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখার পর থেকে লিলি বাতিল।

গুরুজি বললেন, 'একটা বড় বাটি করে একবাটি জল আন তো, মা।'

মায়া চলে গেল। আমার চোখও পেছন পেছন চলল। নাঃ, গুরুজির চেলা বনে কাকি জীবনটা পদসেবা করেই কাটিয়ে দিই।

মায়া আবার এল। চ্যাটালো একটি কাঁসিতে টলটলে জল। মেঝেতে গুরুজির পায়ের কাছে সামনে ঝুঁকে পড়ে নামিয়ে রাখল। সেইসময় কিছু-কিছু জিনিস দেখে আমি প্রায় মরে যাওয়ার মতো জ্বলুম। শরীর নয় তো, মরণ-ফাঁদ!

গুরুজি সেই জলের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'পলটু, তোমার নেকলেস তোমার বাড়িতেই আছে, তোমার বউয়ের কাছে। আর তোমার? কী নাম তোমার?'

'জগন্নাথ।'

'জগন্নাথ। বেশ। তোমার সাঙাতকেও আমি আমার জল-দর্পণে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মুখটা গোল। নাক থ্যাবড়া। চোখ দুটো মার্বেলের মতো। জোড়া ভুরু। ডান ঠোঁটের ওপর কাটা দাগ। কী, মিলছে?

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। ঠিক-ঠিক মিলছে।'

মিলতেই হবে। কী নাম বলেছিলে?'

'গণেশ।'

গুরুজি স্তব্ধ হয়ে চোখ বড়-বড় করে জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী আশ্চর্য! আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। গুরুজির চমক ভাঙল, 'ছ' থেকে সাত মাসের মধ্যে গণেশের ফাঁসি হবে।'

কথা ক'টা বলেই খুব ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন, 'তারা, তারা! তোরা এখন যা। যাওয়ার আগে মাকে প্রণাম করে যা।'

ঠাকুরঘরে মায়া হাঁটু মুড়ে বসে পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। মনে-মনে বললুম, আমার যদি একটা সংসার থাকত। এইরকম একটা শ্যামলী বউ। লিলি? যেমন নাম তেমনি ছিরি। হান্টারওয়ালি। বব চুল। ঠোঁটে লাল রং। মুখে মেকআপ। কটা সুন্দরী!

টেলিফোন বেজেই চলেছে। কেউ ধরে না কেন? বাড়িসুদ্ধ সব

একসঙ্গে সুইসাইড করেছে নাকি? অবশেষে কেউ একজন ধরেছে। মেয়েলি গলা।

'হ্যালো!'

'গণেশ আছে?'

'কে আপনি?'

'আমি যেই হই না, গণেশ আছে কি নেই?'

'নেই। কলকাতার বাইরে গেছে।'

'অত পাঁয়তাড়া না করে এই কথাটাই তো আগে বললে হত।'

ফোনটা দুম করে নামিয়ে রাখলুম। বেটা কলকাতাতেই আছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কেস ঠোকার আগে মুখোমুখি একবার কথা বলতে চাই। এমনি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে ভালো। নয়তো উকিলে খাবে হকের পয়সা। আমি নিজেই একবার যাব। আজই যাব। ওকে না পাই ওর বউকে বলে আসব।

ট্রাম থেকে নামতে টিপটিপ করে বৃষ্টি এল। ট্রামরাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে মোড় নিলুম। রাস্তাটা নেহাত কম চওড়া নয়। দু-পাশে খাড়া-খাড়া বাড়ি। দু-একটা বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া বাগান। এমন কিছু জোর বৃষ্টি নয়। পিটির-পিটির। সময়টা দুপুর-দুপুর। রাস্তাটা তাই নির্জন। পেছনে একটা মোটর সাইকেল আসছে ঝড়ের বেগে। ওই শব্দটাকে আমি ভীষণ ভয় পাই। ছেলেবেলার আতঙ্ক আর কি! একবার ধাক্কা খেয়েছিলুম। যতটা সম্ভব রাস্তার বাঁ-ধারে সরে গেছি। ভীষণ শব্দ ক্রমশই এগিয়ে আসছে। একে নির্জন রাস্তা, তার ওপর দু-পাশে খাড়া-খাড়া বাড়ি। শব্দটা সেই কারণেই আরও জোর মনে হচ্ছে।

সত্যিই আমি প্রস্তুত ছিলুম না। কী ঘটছে বোঝার আগেই ছিটকে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়লুম। মোটর সাইকেলটা বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে সোজা হয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। কোমরে ভীষণ লেগেছে। পড়বার সময় বাঁ-দিকে লাট খেয়েছিলুম, বাঁ-হাতটা মনে হয় ভেঙেই গেছে। হাঁটু দুটো অক্ষত নেই। কপালটাও কেটেছে নিশ্চয়। আচ্ছা জানোয়ার তো! কোনওরকমে উঠে বসতে পেরেছি। উঠে দাঁড়াতে পারব

কি! সামনের বাড়ির দোতলার জানালায় একটি মহিলার মুখ। কী লজ্জার কথা! মেয়েদের সামনে বেইজ্জত। উঠে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। বাড়িটার দেওয়াল ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালুম। পা কাঁপছে। মাথা ঘুরছে। কোমর সোজা হচ্ছে না। উলটো দিকেই একটা লাল রক। একটু বসতে পারলে ভালো হত। আবার যেন মোটরসাইকেলের আওয়াজ আসছে কানে। সর্বনাশ! আবার ফিরে আসছে নাকি? খুব দ্রুত আসছে। এবার মারলে আর বাঁচব না। বাঁচার একমাত্র রাস্তা কোনওরকমে রকে গিয়ে ওঠা। ঝড়ের বেগে যমদূত এগিয়ে আসছে। ওই তো রক। না, আর হল না। শূন্যে উড়ে গেলুম যেন! শরীরের সমস্ত হাড়গোড় খুলে গেল। মোটরসাইকেলের তীব্র শব্দ। কোথাও সশব্দে জানালা বন্ধ হল। মেয়েলি চিৎকার।

একটা শিশি ঝুলছে। স্বচ্ছ একটা নল হাতে এসে ঢুকেছে। নাকে আর-একটা নল। শরীরটা সিসের মতো ভারী। কে যেন বললেন, 'জ্ঞান ফিরেছে, জ্ঞান ফিরেছে।'

খুটখাট জুতোর শব্দ। চোখে ঝাপসা দেখলেও দেখতে পাচ্ছি, একটা মুখ, মাথায় সাদা টুপি। সাসা অ্যাপ্রন। নীলপাড় শাড়ি। তিনটি মাত্র শব্দ আমি উচ্চারণ করতে পারলুম। মার্ডার, পুলিশ, গণেশ। তারপর আমি কীরকম এক আলোর স্রোতে ভেসে গেলুম। যেতে-যেতে দেখলুম, একটা ফাঁসিকাঠ। গোল দড়ির ফাঁস, গণেশ। একপাশে গুরুজি লাল চেলি পরে, আর-একপাশে আমি। আমার হাতে পুলিশের ব্যাটনের মতো গোল করে পাকানো, শীল অ্যান্ড সরকার কোম্পানির পার্টনারশিপ ডিড।

এইসব কথা আমি কী করে লিখলুম জানি না। আমি যদি লিখে থাকি, তাহলে আমি মরিনি। কারণ, মরা মানুষ আর যাই পারুক, লিখতে পারে না। আর আমি না মরলে, গণেশের ফাঁসি হয় না। ফাঁসি না হলে, দৈব মিথ্যে হয়ে যায়। তাহলে কী যে হয়েছে, কে জানে!

ফেরা

অনেকদিন পরে আমি আমার ছেলেবেলার জায়গায় ফিরে এলুম। আমি এখন দূর বিদেশে থাকি। কী করব? ভাগ্য আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই তো যেতে হবে। কয়েকদিনের জন্যে এসেছি, মন ভীষণ টানল, তাই চলে এলুম। এখানে আমার আপনজন কেউ থাকে না। সবাই মারা গেছেন। আমার বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জেঠিমা, আমার দিদি। কেউ আর বেঁচে নেই। এক একটা পরিবার এইরকম থাকে, যে পরিবারের সবাই মারা যায়। তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই। একসঙ্গে এক জায়গায় বসে সব গল্প হবে, মুড়ি তেলেভাজা খাওয়া হবে, ঠাকুরঘরে পুজোর ঘণ্টা বাজবে, রান্নাঘর থেকে ভাল গন্ধ ভেসে আসবে। এইসব সুখ তাদের কপালে লেখা নেই। আমি সেইরকম একজন মানুষ। মৃত্যু আমার জীবন থেকে সকলকে কেড়ে নিয়ে গেছে। এই বিশাল পৃথিবীতে আমি একেবারে একা। আমার কিছুই নেই, আছে একগাদা গল্প। বাবার গল্প, মায়ের গল্প, আমার দিদির গল্প। লিখতে জানলে কত কি লেখা যেত।

ছেলেবেলার এস জায়গাটা গঙ্গার ধারে। সেই গঙ্গার ধারেই আমাদের স্কুল। খুব পুরনো স্কুল। স্কুলটা এখনো আছে; কিন্তু এ কী অবস্থা! বাড়িটায় কত দিন রং পড়েনি। এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সামনেই সেই দারোয়ানের ঘর। তালা বন্ধ। আমি যখন ছাত্র ছিলুম তখন এই ঘরে রামাধর থাকত আর থাকত তার ভাই কেশোরাম। দুজনেই ভীষণ ভাল ছিল। গরমকালে আমাদের মর্নিংস্কুল হতো। গেটের দু'দিকে দুটো চাঁপা গাছ ছিল। ভোরে তার কী সুগন্ধ! গাছ দুটো এখন আর নেই। রামাধর, কেশোরামেরও থাকার কথা নয়। তারাও এস পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

গেটের পাশে রামাধর ছোলাকাবলি বিক্রি করত। বাবা রোজ আমাকে এক আনা পয়সা দিতেন। সেই এক আনায় ছোলাকাবলি হতো কাঁচা শালপাতায়। ঝালঝাল, পেঁয়াজটেঁয়াজ দেওয়া। স্বাদটা এখনো মুখে লেগে আছে। ছেলেবেলার খাওয়া তো ভোলা যায় না। এখন মর্নিংস্কুল নেই, রামধর নেই, ছোলাকাবলি খাওয়ার ছেলেও নেই। যুগ পাল্টে গেছে। বড় শান্ত, রামভক্ত মানুষ ছিল রামাধর। কেশোরামের বয়েস কম ছিল। সে সবসময় হাসত। বন্ধ ঘরটার দিকে তাকিয়ে তাদের কথা



মনে পড়ে গেল। এই ঘরটায় এখন কেউ থাকে কি!

পাথর বাঁধানো ছোট্ট পথটুকু পেরিয়ে স্কুলের গাড়িবারান্দার তলায় এসে দাঁড়ালুম। পরপর চারটে লম্বা চওড়া ধাপ। ভেঙেচুরে গেছে। অপরিষ্কার। কতদিন ঝাঁট পড়েনি। ডানপাশের দেয়ালে মার্বেল পাথরের ফলক। এই স্কুলের কৃতী ছাত্রদের নাম, পরবর্তী জীবনে যাঁরা গণ্যমান্য হয়েছেন। পঞ্চাশ সালের পর আর কারো নাম নেই। সেই ফলকটা পুরো পড়লুম। পড়ে ভেতরে ঢুকলুম। করিডর। দুপাশে বড় বড় ক্লাসরুম।

খড়খড়ি পাল্লার দরজা। ভেঙেচুরে গেছে। ভেতরে সার সার বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ। ময়লা, ক্ষতবিক্ষত। জানলার ধারে ধারে ধারে কত বছরের আবর্জনার স্তূপ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লেগে গেল। মনে হলো ক্লাসরুম ছেলেতে ভরে গেছে। সেকেন্ড বেঞ্চের ধারে আমি বসে আছি। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছেন কুমুদবাবু। প্রথমে রোলকল করছেন। ওয়ান, টু। যেই সেভেন বললেন, আমি অমনি দাঁড়িয়ে উঠে ইয়েস স্যার বলছি। বোর্ডে চক দিয়ে অঙ্ক লেখার খসখস শব্দ। টেবিলের ওপর ডাস্টার ঠোকার খটাস খটাস। একটা সরল কর লিখেছেন। এখনি আমার ডাক পড়বে—বোর্ডে আয়। অঙ্কটা কর। করতে পারলে দু'চোখ ভরা আনন্দ নিয়ে তাকাবেন। বলবেন, ভেরি গুড। না পারলে দু'চোখে জল—এই সামান্য অঙ্কটা পারলি না! লেখাপড়া একেবারেই করছিস না রে! তোদের ক'জনের ওপর আমার যে বড় আশা ছিল রে!

হঠাৎ চটকাটা ভেঙে গেল। কেউ কোথাও নেই। শূন্য, অপরিষ্কার ক্লাসরুম। ভ্যাপসা একটা গন্ধ। ব্ল্যাকবোর্ডটা হেলে আছে। ছুটির আগে খড়ি দিয়ে কে লিখে গেছে—পার্থ পাঁঠা। আমরাও এই সব লিখতুম। আমার সহপাঠী কিশোর ভীষণ ভাল কার্টুন আঁকত, শুনেছি সে এখন প্যারিসে আছে। মস্ত বড় চাকরি করে, ফরেন সার্ভিস। কে জানত কিশোর এত বড় হবে। প্রায় রোজই ক্লাসে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকত দুষ্টুমি করার অপরাধে। দুষ্টুমিতে কিশোরের মাথা খুব খেলত। মাস্টারমশাইরা মেজাজ ভাল থাকলে বলতেন—কিশোর, এই মাথাটা যদি পড়ায় লাগাতে পারিস, তোকে আর আটকায় কে?

একদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। কিশোরের ঠিক সামনে বসত সত্যেন। সত্যেনের স্বভাব ছিল শিক্ষকমশাই ক্লাস থেকে বেরলেই যে কোনো একটা প্রশ্ন নিয়ে, স্যার স্যার করে তাঁর পেছন পেছন যাওয়া। দেখাতে চাইত, সে কত উৎসাহী ভাল ছাত্র! কী ভীষণ তার জানার আগ্রহ! আমরা বলতুম, সত্যেনের একস্ট্রা কারিক্যুলার

অ্যাকটিভিটি। সেদিন ইতিহাসের ক্লাস শেষ হলো। দ্বিজেনবাবু ক্লাস থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছেন, সত্যেন যথারীতি পেছনে ছুটেছে। তার প্যান্টের পেছনের বগলসে লম্বা একটা দড়ি বাঁধা, সেই দড়ির শেষে একটা খালি টিনের কৌটো। কৌটোটা ঢ্যাং ঢ্যাং, ঠ্যাং ঠ্যাং শব্দে লাট খেতে খেতে চলেছে। যেন দমকল যাচ্ছে। ক্লাসসুদ্ধু সবাই হইহই করে হাসছে। দ্বিজেনবাবু পেছনে ওই শব্দ শুনে ভয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়চ্ছেন। কিশোর চিৎকার করছে, ফায়ার, ফায়ার। হেডমাস্টারমশাই হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছেন। সত্যেন তখনো বোঝেনি ব্যাপারটা কী। শব্দটা কেন হচ্ছে। ফায়ার, ফায়ার শুনেছে, দ্বিজেনবাবু প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছেন দেখেছে। এইবার সত্যেন নিজেই চিৎকার শুরু করল, আগুন, আগুন। সেই সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠছে, আর খালি টিনের কৌটো আরো শব্দ করছে। এইবার হেডমাস্টারমশাই সত্যেনের চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক পেটানি শুরু করলেন। সত্যেন তারস্বরে চিৎকার করছে, আর বলছে, 'আমি কি করেছি স্যার, আমাকে কেন মারছেন, আমি তো স্যারের কাছে সিপাই বিদ্রোহের ভেতরের কথাটা জানতে আসছিলুম।' 'লেজে কৌটো বেঁধে সিপাহি বিদ্রোহ! হনুমান। ছাগল।' আবার ধোলাই। রামাধর এসে সত্যেনকে বাঁচাল। পেছন থেকে দড়ি-কৌটো খুলে দিল। কিশোর তখন ভীষণ মনোযোগী ছাত্র! ব্যাকরণ খুলে শব্দরূপ পড়ছে। পরের ক্লাসেই নির্মলবাবুর বাংলা ব্যাকরণ।

সেই সত্যেন এখন কোথায়! শুনেছি কোনো এক বড় কলেজে লাইব্রেরিয়ান হয়েছে। সরকারি চাকরি। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম। সিঁড়ির সেই বাঁক, যে বাঁকে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টারমশাই সত্যেনকে পিটেছিলেন। মারটা খাওয়া উচিত ছিল কিশোরের। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে কিশোর বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। আমি রাজসাক্ষী হলে কিশোরের সাজা হতো। সত্যেনের পাকামি চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ির ধাপ, হাতল আর আগের মতো নেই। সর্বত্র দৈন্য আর অবহেলার ছাপ। পঞ্চাশ বছর বয়েস বেড়েছে। জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। এত ছেলে তৈরি করেছে এই স্কুল, কেউ এই বৃদ্ধের সেবা করে না। সবাই সেই অর্থে কুপুত্র। দোতলার কোনো একটা ঘর থেকে টাইপরাইটারের শব্দ আসছে। দোতলার লবিতে শিক্ষকমশাইদের বসার সেই বিশাল টেবিলটা আছে। মেহগনি কাঠের। আমাদের সময় ঝকঝক করত। এখন একেবারে কালো ভূত। একগাদা চা খাওয়া এঁটো ভাঁড় পড়ে আছে উল্টেপাল্টে। মনে হচ্ছিল, টেবিলটাকে পরিষ্কার করি। এক সময় দেশের কত নামকরা বিখ্যাত শিক্ষক এখানে বসে গেছেন। বড় বড় পণ্ডিত। যশ, খ্যাতি, পুরস্কার, সরকারি অনুগ্রহ, কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেননি তাঁরা। তাঁরা শুধু জ্ঞান দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে ভাল ছাত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন। অতীতের সেই সব মহান শিক্ষকদের আমি দেখতে পাচ্ছি। এই তো বসে আছেন, প্রাণধনবাবু, বঙ্কিমবাবু, নির্মলবাবু, অনিলবাবু, ডঃ কাঞ্জিলাল, পণ্ডিত ভুজঙ্গবাবু। সবাই যেন একসঙ্গে বসে আছেন। সুপণ্ডিত নলিনীবাবু গম্ভীর মুখে আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে কিছু বলছেন। সবাই গভীর আগ্রহে শুনছেন।

শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বললেন, 'কী চাই? এখানে কী করছেন? স্কুলের এখন ছুটি।'

'পঞ্চাশ বছর আগে এই স্কুলে আমি প্রথম ভর্তি হয়েছিলুম; তখন কাঞ্জিলাল স্যার হেডমাস্টারমশাই ছিলেন।'

'ছিলেন ছিলেন। এখন আর তিনি এখানে থাকেন না।'

'সে আমি জানি। তিনি ভবপারে। আমি এখন বিদেশে থাকি। তিরিশ বছর পরে এসেছি, ভাবলুম পুরনো স্কুলটা একবার দেখে যাই। আপনি কী শিক্ষক?'

'না, আমি ক্লার্ক।'

'আমাদের সময় পাঁচুবাবু ছিলেন হেডক্লার্ক। ভারি সুন্দর মানুষ

ছিলেন। দেশে তাঁর অনেক নারকেল গাছ ছিল। আমাদের পুজোর পর স্কুল খুললে খুব নারকেল নাড়ু খাওয়াতেন।'

'স্কুল দেখতে এসেছেন তাই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হাতে করে কিছু এনেছেন, সন্দেশটন্দেশ?'

'কই না তো!'

'কবে আক্কেল হবে? খালি হাতে গুরুজনের কাছে আসতে আছে? চা, কেক খাওয়ান।'

'কোথায় পাবো?'

'পয়সা ছাড়লেই পাওয়া যাবে। দশটা টাকা দিন।'

'সে আমি দিচ্ছি। দশ কেন পঞ্চাশ দিচ্ছি।'

'অত কাপ্তেনি ভাল নয়, রয়েসয়ে খরচ করতে হয়। দিনকাল ব্যাড, ভেরি ভেরি ব্যাড।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'আমার নাম মোহন মিত্তির।'

মোহন মিত্তির একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'জগা'। বুলেটের মতো তিরিশ-বত্রিশ বছরের এক ছোকরা যে ঘরে টাইপ হচ্ছিল সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মোহনবাবু বললেন, 'যাও, চা আর খাস্তা নিমকি বিস্কুট নিয়ে এস। স্বাস্থ্য অবহেলা কোরো না। সুযোগ পেলেই খাবে। ইনি আমাদের এক্স স্টুডেন্ট। কী নাম আপনার?'

'প্রশান্ত চ্যাটার্জি।'

'কী করেন?

'আমি আমেরিকায় চাকরি করি।'

'এই স্কুলের ছেলে আমেরিকায়! তাজ্জব কি বাত!'

'কেন স্কুলটা খারাপ না কি? নিচের ওই মার্বেল ফলকের নামগুলো দেখেননি?'

'দেখবো না কেন? এ দেশ হলো এক পিসের দেশ।'

'তার মানে?'

'মানে সব ওয়ান পিস। এক পিস রবীন্দ্রনাথ, এক পিস নজরুল, এক পিস শরৎচন্দ্র, নেতাজী সুভাষ। ভাঙিয়ে যদ্দিন চলে। এ বছর আমাদের রেজাল্ট জানেন? সেন্ট পারসেন্ট।'

'সেন্ট পারসেন্ট পাশ!'

'আজ্ঞে না। সেন্ট পারসেন্ট ফেল। পকেটে বিলিতি সিগারেট নেই?'

'আছে।'

'চেপে রেখেছেন কেন ভাই? মনটাকে কখনো সঙ্কীর্ণ করবেন না। ওই জন্যেই বাঙালি তলিয়ে যাচ্ছে।'

এক প্যাকেট মার্লবোরো ছিল পকেটে, মোহন মিত্তিরকে দিতেই খুব খুশি। ঘরে গিয়ে বসেই সেই গানটা মনে পড়ল, ধুলায় ধুলায় ধূসর হব। এত ধুলো কল্পনা করা যায় না। পঞ্চাশ বছরের ধুলো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'মোহনবাবু মাঝেসাঝে ঝাড়াঝাড়ি করলে কেমন হয়?'

'খুব খারাপ হয়। ধুলো মানেই ইনফেকসান, জার্ম। যত ঝাড়বেন তত উড়বে। সাবধানে রেখে দিলে ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে মশাই অনেক বড় বড় জিনিস আছে, সামান্য ধুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বুঝেছি, বিদেশে থেকে আপনার বাতিক হয়েছে। এদেশে তো থাকতে পারবেন না। এখানে ধুলো, ধোঁয়া, কাদা, গর্ত, গু, গোবর এই সব নিয়েই তো থাকতে হবে।'

চা-বিস্কুট খাওয়া হলো। মোহন মিত্তিরকে বেশ লাগছে। মজার মানুষ। জগা ছেলেটিও ভাল। তবে রামাধর, কেশোরামের সঙ্গে তুলনা চলে না। তারা ছিল সাধু চরিত্রের মানুষ। অবশ্য সেই যুগটা ছিল---দেবতাদের যুগ। মোহনবাবুকে বললুম, 'একবার হেডমাস্টারমশাইয়েব ঘরটা দেখাবেন! আমার খুব প্রিয় ঘর ছিল।'

'সে আর এমন কথা কী! জগা ঘরটা খুলে দে।'

ঘরটা খোলামাত্রই বদ্ধ একটা বাতাস বেরিয়ে এল। শিক্ষার ডেডবডি থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। আলমারিগুলো আছে, বই একখানাও নেই।

ডানদিকের আলমারিতে ছিল এনসাইক্লোপেডিয়ার সেট। লোপাট। মোহন মিত্তিরকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু হেডমাস্টারমশাইয়ের সেই বিখ্যাত বড় চেয়ারটা কী হলো?

'মোহনবাবু, চেয়ারটা?'

'সেই সুন্দর বড় চেয়ারটা? সেটা মাস্টারমশাইরা মারামারি করে ভেঙে ফেলেছেন।'

'মাস্টারমশাইরা মারামারি!'

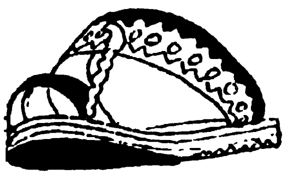
'ও আপনি তো বিদেশে থাকেন, জানবেন কী করে? স্কুলে যে এখন রাজনীতি ঢুকেছে। ডান আর বাঁ, দু'হাতে এখন তালি বাজছে। আর ছাত্ররা ধরে সানাইয়ের পোঁ।'

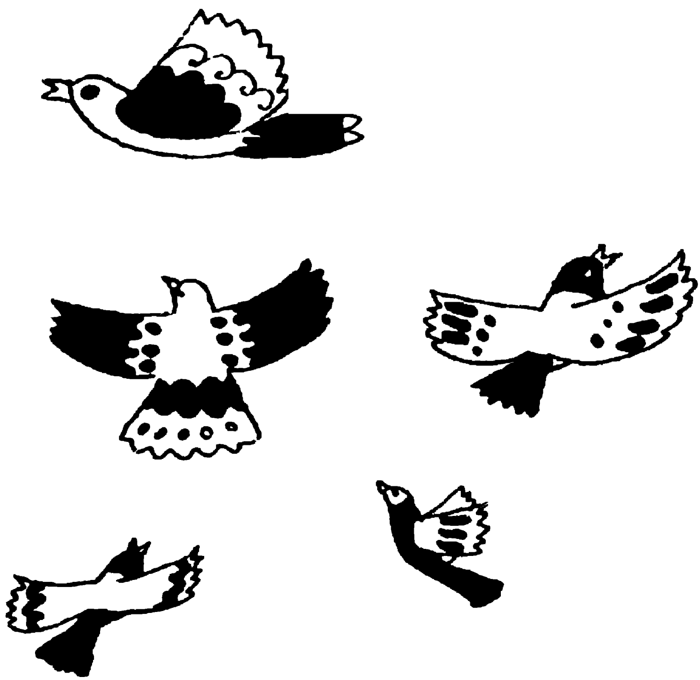
মোহন মিত্তির আবার টাইপরাইটারে বসে গেলেন আর জগা বসে গেল খাতা সেলাই করতে। সামনেই মনে হয় পরীক্ষা আসছে। আমি স্কুলের ছোট্ট খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালুম। কতকালের প্রাচীন সেই বিশাল মেহগনি গাছটা এখনো আছে। এই গাছের তলায় আমি আর কিশোর কতদিন বসেছি। গল্প হচ্ছে তো হচ্ছেই। নলিনীবাবু আমাদের ভূগোলের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কত দেশ, কত মানুষ, কত নদী, পাহাড়, সমুদ্র। আমরা কল্পনায় সেই সব জায়গায় চলে যেতুম। ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে আসত। বিশাল উঁচু গাছ, মাথায় টিয়ার ঝাঁক।

গাছটার তলায় বসলুম। ভীষণ একা লাগল। কিশোর নেই, সত্যেন নেই, সন্তোষ নেই, তরুণ নেই। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, দেখি তো আছে কি না! মেহগনি গাছের ওপারে যে ধরটা পাঁচিলের দিকে, সেই ধারে একবার দোলের আগের দিন আমি আর কিশোর ছুরি দিয়ে আমাদের নাম খোদাই করেছিলুম। সেই বছরটাই ছিল আমাদের শেষ বছর। দেখি তো সেই নাম দুটো আছে কি না! আশ্চর্য! নাম দুটো ঠিকই আছে—কিশোর প্রশান্ত। নাম দুটো পাশাপাশি, মানুষ দুটো কত দূরে! জীবনেও আর দেখা হবে না।

যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে এসে আর শেষ হয় না। জীবন নদীর মতো। সেই যে একবার চলতে বেরলো, আর ফেরার নাম নেই।

সামনে, আরো সামনে। সমুদ্রে গিয়ে শেষ। হয়তো আর আমার দেশে ফেরা হবে না। পকেটে একটা ছুরি ছিল। বিদেশি ছুরি। বের করলুম সেটাকে। জানি পাগলামি, তবু সেই সেদিন যেমন খোদাই করেছিলুম, সেইভাবে ধরে ধরে লিখলুম—এসেছিলুম। কিশোর যদি কোনোদিন আসে, আর যদি মনে করে দেখে, তাহলে দেখবে আমি এসেছিলুম, মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আবার ফিরে গিয়েছিলুম আমাদের ছেলেবেলায়।



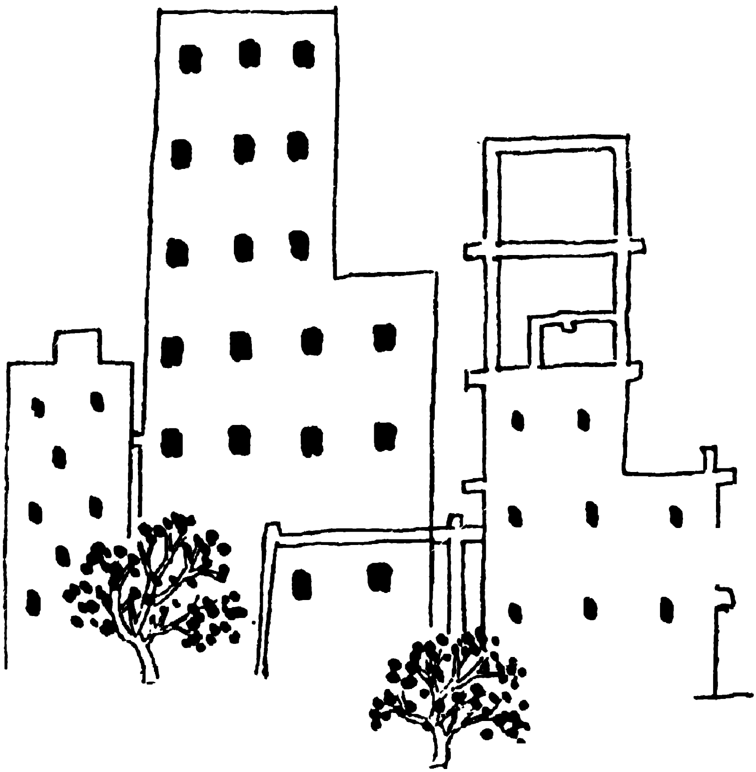


মুখপত্র

ফিরে পেতে চাই
        শৈশবের সেই সব সুন্দর দিন
সবুজ মাঠে সঙ্গীদের সমাবেশে
খেলার ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্ন বোনা।
শিশুর ভিতের ওপরে
এইযে গজিয়ে ওঠা
দুঃস্বপ্ন দুশ্চিন্তায় ভরা

এই যে বৃদ্ধ ইমারত
সেখানে গান গায় কোন পাখি?
খাঁচা খুলে দাও
দেখো উড়ে গেল জীবনের গান
গেয়ে
ছিল যে এতকাল বন্দী।
কবিতা সেই স্বাধীন বিহঙ্গ
ছন্দের বাণীর নিপুণ রচনায়
গেয়ে যায় সব মানুষের সব গান
বলে যেতে চায়
জরা নেই, মৃত্যু নেই
নেই অবসান।
শুরু নেই শেষ নেই
চির অবস্থান।





জবাব নেই

আমাকে প্রশ্ন করেছিল
বয়েসের তুলনায় নির্ভীক এক কিশোর
আমাদের শৈশব কেড়ে নিলে কেন?
সবুজ দিগন্তছোঁয়া মাঠে
সারি সারি কংক্রিটের খাঁচা

খোপে খোপে মানুষের খেঁচাখেচি
একটি দুটি করুণ গাছ এখানে ওখানে
পড়ার টেবিলে বিষণ্ন বালক
স্তূপাকার বই
কেউ আর বাজায় না বাঁশি
ঘর ছেড়ে বেরিয়ো না তুমি
সময়ের পিঠে চেপে
ছোটাও তুরঙ্গ তোমার
টাকা চাই টাকা
গাড়ি বাড়ি
ফ্যান ফোন ফ্রিজ
সফল সুফলা মানুষ হও
অমানুষ হলেও ক্ষতি নেই॥